পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে আদিবাসী পাহাড়ি নারীর অবস্থান

মঙ্গল কুমার চাকমা

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে
আদিবাসী পাহাড়ি নারীর অবস্থান

মঙ্গল কুমার চাকমা

প্রকাশকাল
মার্চ ২০১০

প্রকাশক
বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (বিএনপিএস)
কল্পনা সুন্দর
১৩/১৪ বাবর রোড, ব্লক বি
মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেট
ঢাকা ১২০৭

ফোন : ৮১১১৩২৩, ৮১২৪৮৯৯, ফ্যাক্স : ৯১২০৬৩৩
ইমেইল : bnps@bangla.net
ওয়েবসাইট : www.bnps.org

© বিএনপিএস

প্রচ্ছদের ড্রইং
কনকচাঁপা চাকমা

মুদ্রণ
দি স্টার প্রেস
০১৭১৫-০০৪২৩৫

দাম : ১২০ টাকা

ISBN: 978-984-8834-01-5

সূচিপত্র

প্রাককথন	৭-৮
সারসংক্ষেপ	৯-১০
ভূমিকা	১১-১৩
পটভূমি	১৪-২০
আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী	১৪
ভৌগোলিক অঞ্চল	১৪
জনমিতি	১৪
ঐতিহাসিক পটভূমি	১৫
পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনব্যবস্থা	১৮
পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচারব্যবস্থা	১৮
পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থা	১৯
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি : উন্নয়ন ও সুশাসনের অভিযাত্রা	২১-২৮
সংলাপ প্রক্রিয়া ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর	২১
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির প্রতি সমর্থন	২১
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরোধিতা	২২
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বৈশিষ্ট্য	২২
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও নারী সদস্যপদ সংরক্ষণ	২৫
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের সার্বিক অবস্থা	২৬
পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের আন্দোলন	২৯-৩৩
পাহাড়ি জাতীয় সংগ্রামের সাথে নারীমুক্তি আন্দোলনের পদযাত্রা	২৯
সশস্ত্র আন্দোলনে পাহাড়ি নারীর অংশগ্রহণ	৩০
গণআন্দোলনে পাহাড়ি নারী	৩২
আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পাহাড়ি নারী	৩২
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী নারী সংগঠনের পদচারণা	৩৩
আদিবাসী নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন	৩৪-৫০
সংবিধান, রাষ্ট্রীয় নীতি ও আদিবাসী পাহাড়ি নারী	৩৪

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ৩৫
জাতীয় সংসদে আদিবাসী পাহাড়ি নারী ৩৮
পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থায় আদিবাসী পাহাড়ি নারী ৩৯
স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় আদিবাসী পাহাড়ি নারী ৪৩
প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে আদিবাসী পাহাড়ি নারী ৪৭
রাজনৈতিক দলগুলোতে আদিবাসী পাহাড়ি নারী ৪৯

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পাহাড়ি নারী ৫১-৭০

আদিবাসী সমাজে নারীর অবস্থান ৫১
সম্পত্তির উত্তরাধিকারে আদিবাসী পাহাড়ি নারী ৫২
প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থায় আদিবাসী পাহাড়ি নারী ৫৪
উৎপাদনে আদিবাসী পাহাড়ি নারী ৫৮
উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আদিবাসী পাহাড়ি নারী ৫৯
কর্মসংস্থানে আদিবাসী পাহাড়ি নারী ৬০
শিক্ষায় আদিবাসী পাহাড়ি নারী ৬৩
স্বাস্থ্য-চিকিৎসায় আদিবাসী পাহাড়ি নারী ৬৬
গ্রামীণ ও হস্তশিল্পে আদিবাসী পাহাড়ি নারী ৬৭
প্রত্যাগত শরণার্থী পাহাড়ি নারীদের অবস্থা ৬৮
অভ্যন্তরীণ পাহাড়ি উদ্বাস্তু নারীদের অবস্থা ৬৯

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-উত্তর পরিস্থিতি ও নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা ৭১-৭৯

পারিবারিক সহিংসতা ৭১
সামাজিক সহিংসতা ৭১
সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ৭২
সুবিচার ও আইনি সহায়তা ৭৬

কেইস স্টাডি ৮০-৮৯

কেইস ১ : কণিকা চাকমা বঞ্চিত হন স্বামীর ভূসম্পত্তি আর কার্বারী পদ থেকে ৮০
কেইস ২ : অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নির্ভীক সংগঠক মাধবীলতা চাকমা ৮২
কেইস ৩ : পাশবিক লালসার শিকার হয়ে অসহায় পাহাড়ি বিধবা শুধু কাঁদেন ৮৪
কেইস ৪ : বাগবাগিচা ও জায়গা-জমির জন্য বসতি স্থাপনকারীরা কেড়ে নিল অসহায় পণেমালার জীবন ৮৬
কেইস ৫ : জীবনসংগ্রামে অকুতোভয় যোদ্ধা শেফালিকা ত্রিপুরা ৮৮

সুপারিশমালা ৯০-৯৩

ক. সংবিধান সংক্রান্ত ৯০
খ. আন্তর্জাতিক চুক্তি ও জাতীয় নীতিমালা সংক্রান্ত ৯০

গ. জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ৯০
ঘ. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ৯১
ঙ. উৎপাদন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত ৯২
চ. শিক্ষা সংক্রান্ত ৯২
ছ. চাকুরি ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত ৯২
জ. সহিংসতা প্রতিরোধ সংক্রান্ত ৯২
ঝ. সম্পত্তিতে আদিবাসী পাহাড়ি নারীর উত্তরাধিকার ৯৩
ঞ. আদিবাসী নারী নেতৃত্বের ক্ষমতায়ন ৯৩
তথ্যপঞ্জি ***৯৪-৯৬***

প্রাককথন

মানবজাতির ক্রমোন্নয়নের ইতিহাসের বর্তমান ধাপে সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী আর শুধু বাণীর পর্যায়ে রাখা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না— মানুষ সমাজে তার প্রতিফলন চায়। এ না হলে একদিকে যেমন মানুষ নানা সমস্যা-সঙ্কুলতার মধ্যে হাতপা বাঁধা অবস্থায় বেঁচে থাকতে বাধ্য হয়, অন্যদিকে তেমনি সমস্ত শুভবাণী অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়। তাতে শুভবাণীগুলো মানুষের ব্যবহারিক জীবনযাপনে কোনো কার্যকর প্রভাব না রেখে কেবল ভার বৃদ্ধি করে যেতে থাকে।

একথা অনস্বীকার্য যে, জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় নারীর সমঅংশগ্রহণ অপরিহার্য। যেকোনো সমাজ বা রাষ্ট্র কতটা অগ্রসর, সেখানে গণতন্ত্রের চর্চা কেমন, সুশাসন কতটা কার্যকরী, মানবাধিকার কতটা রক্ষিত হয়, অর্থাৎ ওই নির্দিষ্ট সমাজ বা রাষ্ট্র কতটা সভ্য তা মাপা হয় সেই সমাজ বা রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ কেমন তার নিরিখে। জাতিসংঘ সনদের মুখবন্ধে ছোট-বড়ো নির্বিশেষে সকল জাতির সমস্ত মানুষের সমান অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের কথা বলা হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত জাতিসংঘ নারীসমাজের অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন কনভেনশন ও ঘোষণা প্রণয়ন ও গ্রহণ করেছে। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে কোনো কনভেনশন ও চুক্তি বাস্তবায়নের দায়ভার সদস্য রাষ্ট্রসমূহের ওপর অর্পিত। জাতিসংঘের একটি সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশও জাতিসংঘ গৃহীত সকল কনভেনশন ও চুক্তি বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতার আওতাভুক্ত। অধিকন্তু, বাংলাদেশের সংবিধানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সমান অধিকার ভোগ করার কথা উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও সেখানে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের অপরাপর জনগোষ্ঠীর মতো এখানকার আদিবাসীদেরও সমান অধিকার ভোগ করবার দাবিটি পুরোপুরি ন্যায্য। কিন্তু বাস্তবতা পুরোপুরি ভিন্ন। দেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ যদিও রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে এদেশের নাগরিক হিসেবেই অবস্থান করে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা যথার্থ নাগরিক মর্যাদা ও মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারে না। তারা বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠী কিংবা বসতিকারী জাতিগোষ্ঠীর আগ্রাসন, শোষণ ও নিপীড়নের কারণে ভূমি থেকে ক্রমাগত উৎখাত হয়ে পড়ছে এবং নিজভূমিতে পরবাসী হয়ে জীবনযাপন করছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান, উৎপাদনমূলক অর্থনৈতিক কমর্কাণ্ড, যাতায়াত, পানীয়জলের সরবরাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তারা আজো নানাভাবে অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার। আদিবাসী নারীদের অবস্থা এক্ষেত্রে আরো শোচনীয়। আদিবাসীদের জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা ও জন্মভূমির অধিকার আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ থাকলেও আলাদাভাবে নারীর অধিকারের দাবিগুলো গুরুত্বের সাথে সামনে আসে না। এমনকি বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের মূল স্রোতোধারায়ও আদিবাসী নারীদের ইস্যুগুলো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে মর্যাদা পায় না।

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়াটা ছিল বাংলাদেশের শান্তি ও উন্নয়নের পথে একটি মাইলফলক। এর ফলে কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামেই নয়, সারাদেশেই শান্তির পরিবেশ রচনার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। শান্তিচুক্তির মাধ্যমে সশস্ত্র বিরোধের অবসান রাষ্ট্রের প্রচুর সম্পদ ও মূল্যবান মানবজীবনকে ইতিবাচক উন্নয়নের পথে চালিত করার ও হবার দুয়ার খুলে

দিয়েছিল। পাহাড়ে শান্তির সুবাতাস বইবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়ায় পিছিয়ে থাকা বঞ্চিত আদিবাসী নারীর জীবনমান উন্নয়ন ও সমঅধিকার অর্জনেরও বিশেষ সুযোগ তৈরি হয়। কিন্তু লক্ষণীয় যে, চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার এক যুগ পরেও চুক্তির বৃহদাংশ বাস্তবায়িত না-হওয়ায় আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই আদিবাসী পাহাড়ি নারীর জীবনের বিবিধ বঞ্চনা ঘোচেনি।

শান্তি ও উন্নয়নের জন্য পাহাড়ি নারীর নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা সর্বমহলের জন্যই কর্তব্য মনে করি। তারা এখনো হত্যা, ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, অপহরণ প্রভৃতি সহিংসতার শিকার এবং ন্যায়বিচার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত। এ অবস্থা নিরসনে পার্বত্য শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নসহ আদিবাসী নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। এ বিবেচনায় বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (বিএনপিএস) আদিবাসী পাহাড়ি নারীর অধিকারহীনতার প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি কী মাত্রায় নারীবান্ধব এবং চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি নারীরা কীভাবে সমতা অর্জন করতে পারে, সে বিষয়টি খতিয়ে দেখবার জন্য চলতি সমীক্ষা প্রতিবেদনটি তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য যে, বিএনপিএস আদিবাসী নারীদের উন্নয়নে এই প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা নয়। চুক্তি পরবর্তী সময় থেকেই সংস্থা আদিবাসী জনগোষ্ঠী, বিশেষত আদিবাসী নারীর অধিকার বিষয়ে কর্মকাণ্ড হাতে নিয়েছে। ১৯৯৮-এ পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় উন্নয়ন সংগঠনসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএনপিএস দশটি আদিবাসী নারী ও মানবাধিকার সংগঠনের সাথে সরাসরি কাজ করেছে। এছাড়াও পরবর্তী বছরগুলোতে আদিবাসী নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে নানা কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। এই সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিএনপিএস ইতোমধ্যে পরবর্তী কর্মকাণ্ডের রূপরেখাও তৈরি করেছে।

আমাদের হয়ে এই সমীক্ষা প্রতিবেদনটি তৈরি করে দিয়েছেন আদিবাসী নেতা মঙ্গল কুমার চাকমা। আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁকে নানা প্রয়োজনীয় তথ্য ও মতামত দিয়ে যে সকল সংগঠন ও ব্যক্তি সহযোগিতা দিয়েছেন, তাঁদেরও জানাচ্ছি বিশেষ ধন্যবাদ। এছাড়া বিএনপিএস-এর কর্মী দিলারা রেখা ও শাহনাজ সুমী সমীক্ষাটি সম্পন্ন করায় সমীক্ষককে বিভিন্নভাবে সহায়তা দিয়েছেন এঁদের দুজনের প্রতিও রইল আমার ধন্যবাদ।

আমরা মনে করি, এই প্রতিবেদনটির সাহায্যে আদিবাসী পাহাড়ি নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নারী, মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংগঠনগুলো তাদের কার্যক্রম ও কৌশল চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে। এসব কার্যক্রম আদিবাসী পাহাড়ি নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় যদি ক্ষুদ্র ভূমিকাও রাখতে পারে, তাহলে আমরা আমাদের উদ্যোগটি সফল হয়েছে বলে মনে করব।

রোকেয়া কবীর
নির্বাহী পরিচালক

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রামে ভিন্ন ভাষাভাষী এগারটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী স্মরণাতীত কাল ধরে বসবাস করে আসছে। তাদের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতি, প্রথা ও অভ্যাস, সামাজিক রীতিনীতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, আচার-অনুষ্ঠান, দৈহিক-মানসিক গঠন, আর্থ-রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনযাত্রা ইত্যাদি বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জাতিগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ যদিও রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে নাগরিক হিসেবে অবস্থান করে থাকে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা যথার্থ নাগরিক মর্যাদা ও মৌলিক অধিকার নিয়ে বসবাস করতে পারে না। তারা বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠী কিংবা বসতিকারী জাতিগোষ্ঠীর আগ্রাসন, শোষণ ও নিপীড়নের কারণে জমি থেকে ক্রমাগত উৎখাত হয়ে পড়ছে এবং নিজভূমিতে পরবাসী হয়ে জীবনযাপন করছে।

বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠীর নারীসমাজের মতো আদিবাসী সমাজেও নারীদের অধস্তন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অপরদিকে দেশের বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠীর একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক সহিংসতার অন্যতম শিকার হচ্ছে আদিবাসী পাহাড়ি নারীরা। তারা আদিবাসী হিসেবে সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিগত নিপীড়নের শিকার আর নারী হিসেবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা শোষিত ও বঞ্চিত। যেজন্য আদিবাসী পুরুষের তুলনায় আদিবাসী নারীদের শোষণ-বঞ্চনা মাত্রাগত দিক থেকে প্রায় দ্বিগুণ।

১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তৎকালীন সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির কিছু বিষয় বাস্তবায়িত হলেও চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো এখনো অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়ে গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ফলে আদিবাসী নারীর সার্বিক উন্নয়নের অনুকূল ক্ষেত্র গড়ে ওঠে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতিও ইতোমধ্যে সূচিত হয়েছে। কিন্তু সার্বিকভাবে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও মানবাধিকার প্রেক্ষিতে আদিবাসী পাহাড়ি নারীরা এখনো নানা বঞ্চনা ও অবহেলার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে রয়ে গেছে।

সাধারণভাবে রাজনীতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়ি নারীর অংশগ্রহণ এখনো ব্যাপক নয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধা রাজনীতিতে আদিবাসী পাহাড়ি নারীর সীমিত অংশগ্রহণের অন্যতম কারণ। এছাড়াও পৃষ্ঠপোষকতার অভাব আর জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোতে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের আধিপত্যের কারণে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ কম। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরও আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মৌলিক কোনো অগ্রগতি ঘটেনি। বিশেষ করে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের অংশগ্রহণ এখনো অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে। অন্তর্বর্তী পার্বত্য জেলা পরিষদে নারীদের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই।

বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, কৃষিতে নারীদের অংশগ্রহণ প্রায় ৯০ শতাংশ; কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এই ভূমির ওপর আদিবাসী নারীদের অধিকাংশের উত্তরাধিকারস্বত্ব স্বীকৃত নয়। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রান্তিকীকরণ সত্ত্বেও আদিবাসী নারীরা বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আদিবাসী সমাজে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে পুরুষের তুলনায় নারীদের সম্পৃক্ততা সবচেয়ে

বেশি। কিন্তু পরিবারে, সমাজে ও জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অবদান আজো অবমূল্যায়িত হচ্ছে।

২০০১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে পুরুষের শিক্ষার হার ৪৯.৬ শতাংশের বিপরীতে নারীশিক্ষার হার ৪০.৮ শতাংশ। শিক্ষায় পার্বত্য নারীদের সুযোগলাভ সম্পর্কে তথ্য নিয়ে জানা গেছে, দারিদ্র্য ও আর্থ-সামাজিক পটভূমির কারণে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে তুলনামূলকভাবে মেয়েরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশি। দারিদ্র্য ছাড়াও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য তার অন্যতম কারণ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারি উন্নয়নের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়নের ক্ষেত্র হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিত্তিক স্থানীয় বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (এনজিও) গড়ে ওঠে। তারই অংশ হিসেবে অনেক বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী নারী সংগঠনও পার্বত্য চট্টগ্রামে জন্মলাভ করে। এসব নারী সংগঠন নারীসমাজের সক্ষমতা গড়ে তোলা, তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা, নারীশিক্ষার প্রসার ঘটানো, নারীর স্বাস্থ্যসেবা ও পরিচর্যা, নারীর কর্মসংস্থান বাড়ানো, গ্রামীণ দুস্থ নারীর আয়বৃদ্ধি ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে উৎসাহিত করা, পাহাড়ি নারীদের ওপর চলমান পারিবারিক-সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা ইত্যাদি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-উত্তরকালেও আদিবাসী নারীসহ পাহাড়িদের সুবিচার ও ন্যায্যতা নিশ্চিত হয়নি। এর অন্যতম কারণ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ শাসনব্যবস্থা কার্যকর না হওয়া এবং আদিবাসী পাহাড়িদের অগ্রাধিকার দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়ে স্থানীয় প্রশাসন গড়ে না ওঠা, পার্বত্য চট্টগাম অঞ্চলের বেসামরিকীকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়া, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বাঙালি অভিবাসন সমস্যার নিরসন না হওয়া অন্যান্য কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

ভূমিকা

সাম্প্রতিক সময়ে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে এক ব্রিগেড সৈন্যসহ ৩৫টি অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহারের ঘোষণার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা জাতীয় পর্যায়ে আবারো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং সত্তর দশক থেকে আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়িদের রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়নে সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ৩৫টি অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহারের সরকারি ঘোষণা এসেছে।

বিভিন্ন সরকারের আমলে ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়া বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা জটিল রূপ ধারণ করেছে। এর মধ্যে ১৯৬০ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক কর্ণফুলী নদীর ওপর কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই বাঁধের ফলে আবাদি জমির ৫৪% জমি পানির নিচে তলিয়ে যায়। প্রায় এক লক্ষাধিক লোক নিজ বাস্তুভিটা ও জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ে। এই বাঁধ নির্মাণের ফলে উদ্বাস্তু হওয়া মানুষকে যথাযথভাবে পুনর্বাসন করা হয়নি। এর ফলে আদিবাসী পাহাড়িদের জীবন-জীবিকা, সংস্কৃতি ও জাতিগত সংহতির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

এসব অন্যায় ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে এবং তাদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়িরা সংগঠিত হতে থাকে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে দেখা দেয় অসন্তোষ ও সংঘাত। সরকার এই সমস্যা মোকাবেলার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপকভাবে সেনাবাহিনী মোতায়েন করে এবং সমতল অঞ্চল থেকে হাজার হাজার বাঙালি পরিবারকে সেখানে বসতি প্রদান করে। বসতিস্থাপনকারী এসব বাঙালিরা আদিবাসী পাহাড়িদের ভূমি জবরদখল করে। ফলে আশির দশকে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। ধরপাকড়, জেল-জুলুম, সহিংসতা, হত্যা, অপহরণ, অগ্নিসংযোগ, নিজ বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ, ধর্ষণসহ ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হতে থাকে এবং পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে চরম অবিশ্বাস, সন্দেহ ও দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্র বসতিকারী বাঙালিদের নানাভাবে সহায়তা দিয়ে পরিস্থিতিকে অধিকতর অবনতির দিকে ঠেলে দেয়।

দেশের বিভিন্ন সরকার দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করে। ১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসে। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের নীতি গ্রহণ করে। তার ফলে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা 'শান্তিচুক্তি' নামে পরিচিতি লাভ করে। এর ফলে প্রায় আড়াই দশক ধরে চলা সংঘাতের অবসান ঘটে। এই চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশের দ্বার উন্মোচন করে। এই চুক্তিকে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকারের প্রতি সংবেদনশীল দেশের প্রগতিশীল শক্তি স্বাগত জানায়। কিন্তু নানা কারণে এই চুক্তি এখনো যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি।

২০০৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসে। এই সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব পদক্ষেপ পার্বত্যাঞ্চলে অধিকতর অনুকূল ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গঠনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা যায়।

প্রতিবেদনের প্রতিপাদ্য

এই প্রতিবেদনের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে আদিবাসী পাহাড়ি নারী অধিকারের প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অবস্থা যাচাই করা। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়িদের সার্বিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে কিনা তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের পাশাপাশি বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (বিএনপিএস)-ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি কী মাত্রায় জেন্ডারবান্ধব এবং চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়ি নারীরা কীভাবে সমতা অর্জন করতে পারে ইত্যাদি নিরীক্ষার উদ্যোগ নিয়েছে। নারী ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমতা ও ন্যায্যতা প্রসারে প্রতিশ্রুতিশীল সংগঠন হিসেবে বিএনপিএস এরূপ কাজের উদ্যোগ নিয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে বিএনপিএস একটি ধারণাপত্র প্রণয়ন করতে চায়, যাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে পাহাড়ি নারীর যথাযথ মর্যাদা অর্জিত হয়। সংস্থা এই ধারণাপত্রের ফলাফল ও সুপারিশমালার ভিত্তিতে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

প্রতিবেদনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

সার্বিকভাবে এই ধারণাপত্রের অন্যতম লক্ষ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে নারীর মর্যাদা অর্জন করা। সুনির্দিষ্টভাবে এই প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ আলোকপাত করবার চেষ্টা করা হয়েছে—

- পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়ি নারীর অনুকূলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি কী মাত্রায় জেন্ডারনিরপেক্ষ বা সংবেদনশীল;
- আদিবাসী পাহাড়ি নারীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে কী কী সুযোগ ও সুফল সৃষ্টি হয়েছে;
- জেন্ডার ও অধিকারের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সবল ও দুর্বল দিকগুলো কী কী;
- শান্তিচুক্তি এই অঞ্চলের আদিবাসী নারীদের জাতিগত বৈচিত্র্য কীভাবে আলোকপাত করেছে;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে আদিবাসী নারীর অগ্রগতির জন্য নাগরিক সমাজ ও নারী সংগঠন কী কী করতে পারে।

প্রতিবেদন প্রণয়নের পদ্ধতি

এই প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রথমে প্রাথমিক তথ্য, যেমন জেন্ডার প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বই, জার্নাল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং প্রকৃত ও যথাযথ

তথ্য সন্নিবেশ করার লক্ষ্যে প্রাথমিক তথ্যাবলির পাশাপাশি কতিপয় নারী অধিকার কর্মীর সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্যউপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া এই প্রতিবেদনের সাথে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন ঘটনাবলির কিছু কেইস স্টাডিও যুক্ত করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর সাথে এই ধারণাপত্রকে কেন্দ্র করে মতবিনিময়ের পরিকল্পনা আছে, যেখানে নারী অধিকার বিষয়ে কর্মরত অন্যান্য নেটওয়ার্ক ও সংগঠনকেও সম্পৃক্ত করা হবে।

ধারণাপত্র প্রণয়নে সীমাবদ্ধতা

এই ধারণাপত্র প্রণয়নে বড়ো সীমাবদ্ধতাটি ছিল পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব। সরকারি পরিসংখ্যানে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী বিষয়ে পৃথক কোনো তথ্য না থাকায় আদিবাসী পাহাড়ি সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করা খুবই কঠিন। প্রথমত, ১৯৯১ সালের পর থেকে জাতিগোষ্ঠীভিত্তিক কোনো সরকারি পরিসংখ্যান প্রদান করা হয় না। দ্বিতীয়ত, অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সংস্থা থেকে তথ্য পাওয়াও কঠিন। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও তথ্য সরবরাহে অনীহা ইত্যাদি কারণে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। দুর্গম প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু, স্বল্প জনসংখ্যাসম্পন্ন জাতিগোষ্ঠী, প্রত্যাগত শরণার্থী ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। সার্বিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করেই এসব জনগোষ্ঠীর নারীদের অবস্থা উপস্থাপন করতে হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই ধারণাপত্র প্রণয়নে যাঁরা তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করেছেন সেসব ব্যক্তি এবং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোকে ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে খাগড়াছড়ি জেলার তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা জাবারাং কল্যাণ সমিতি ও খাগড়াছড়ি মহিলা কল্যাণ সমিতি; রাঙ্গামাটি জেলার হিলেহিলি উন্নয়ন সংগঠন, প্রোগ্রেসিভ, গর্জনতলী মহিলা কল্যাণ সমিতি ও গ্রীনহিল; বান্দরবান জেলার গ্রাউস, বিএনকেএস ও অনন্যা নারী কল্যাণ সংস্থার সহযোগিতা স্মরণযোগ্য। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা রাঙ্গামাটি অফিস থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ থেকে যাঁরা তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। প্রকৃত ও যথাযথ তথ্য সন্নিবেশ করার লক্ষ্যে প্রাথমিক তথ্যাবলির পাশাপাশি নারী অধিকার কর্মীর সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে যাঁরা আন্তরিকভাবে এগিয়ে এসেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়ি নারীর সমতা ও ন্যায্যতা আদায়ে ক্লান্তিহীনভাবে কর্মরত সেসব নারীকর্মীদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

এই প্রতিবেদন প্রণয়নে যাঁর সবচেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে এবং যাঁর সহায়তা ছাড়া এই প্রতিবেদনের জন্য প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা, সাক্ষাৎকার নেয়া, বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করা কোনোটাই হয়ত সম্ভব হতো না, তিনি হচ্ছেন বন্ধুবর দীপায়ন খীসা। তাঁর এই কার্যকর ও সক্রিয় অবদান ও ভূমিকার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। পরিশেষে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবীর ও সমন্বয়কারী দিলারা রেখাকে ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের সক্রিয় ও কার্যকর উদ্যোগ ও অঙ্গীকারের ফলেই এই ধারণাপত্র বাস্তব রূপ লাভ করেছে।

পটভূমি

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী

চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, মুরুং, বম, লুসাই, পাংখো, খুমী, খিয়াং ও চাক ভিন্ন ভাষাভাষী এই এগারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির আবাসভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম। ভিন্ন ভাষাভাষী এ সকল আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী সমষ্টিগতভাবে 'পাহাড়ি' বা 'জুম্ম' নামে সমধিক পরিচিত। এছাড়া অতি স্বল্প জনসংখ্যা নিয়ে গুর্খা, অহমিয়া ও সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর লোকও এ অঞ্চলে বাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী আদিবাসী পাহাড়িদের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতি, প্রথা ও অভ্যাস, সামাজিক রীতিনীতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, আচার-অনুষ্ঠান, দৈহিক-মানসিক গঠন, আর্থ-রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনযাত্রা ইত্যাদি বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যুগ যুগ ধরে তারা নিজস্ব সমাজ, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, ধর্ম-ভাষা ও স্বশাসন নিয়ে এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে।

ভৌগোলিক অঞ্চল

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আয়তন ৫,০৯৩ বর্গমাইল (১৩,৩১৮ বর্গকিলোমিটার)। এর উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ভারতের ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে ভারতের মিজোরাম ও মায়ানমারের আরাকান ও চীন প্রদেশ এবং পশ্চিমে বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা। ভূ-প্রাকৃতিকভাবে বাংলাদেশের অপরাপর পলিমাটিযুক্ত সমতল জেলাগুলো থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির গঠন ও ধরনে বিস্তর তফাৎ রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা দুর্গম পাহাড় ও উঁচু ভূমি নিয়ে গঠিত, যা মূল্যবান বনজ বৃক্ষ ও বন্যপ্রাণীতে ভরপুর। পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট ভূমির ৬৬ শতাংশ এলাকা বন অধ্যুষিত। এ হিসেবে সমগ্র বাংলাদেশের মোট বনভূমির ৫০ শতাংশের অধিক বনভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত। যদিও পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন সমগ্র বাংলাদেশের এক-দশমাংশ, কিন্তু নিবিড় চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম। ১৯৬৪-'৬৬ সালে কানাডার ফরেস্টল ফরেস্ট্রি অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টারন্যাশন্যাল লিমিটেড-এর ভূমি জরিপ রিপোর্ট অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের চাষযোগ্য ধান্যজমির ('এ' শ্রেণিভুক্ত) পরিমাণ মাত্র ৩.১ শতাংশ তথা ৭৬,৪৬৬ একর।[১]

জনমিতি

২০০১ সালের আদমশুমারি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যা ১৩,৪২,৭১৩ জন। তন্মধ্যে আদিবাসী পাহাড়ি ৭,৩৬,৬৮২ জন এবং বাঙালি ৬,০৬,০৫৮ জন। উল্লেখ্য যে, ১৯৪১ সালের আদমশুমারি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যা ছিল ২৪৭,০৫৩ জন। তন্মধ্যে মাত্র ৭,২৭০ জন ছিল বাঙালি। ১৯৪১ সালের পাহাড়ি-বাঙালি অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৯৭.০৬ শতাংশ ও ২.৯৪ শতাংশ। সরকারি উদ্যোগে '৭৯ থেকে '৮৪ সালের মধ্যে দেশের সমতল জেলাগুলো থেকে ৪

[১] পার্বত্য চট্টগ্রামের বন ও ভূমির অধিকার, রাজা দেবাশীষ রায়, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনটিগ্রেটেড মাউন্টেন ডেভেলপমেন্ট (ইসিমোড), কাঠমুণ্ডু, নেপাল, ২০০৪

লক্ষাধিক বাঙালি অভিবাসীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি প্রদান করা হয়। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে জনসংখ্যার চাপ সৃষ্টি হয়। অনুমান করা হয় হয় যে, ৬ লক্ষাধিক বাঙালি জনসংখ্যার মধ্যে ৪ লক্ষাধিক জনসংখ্যা হচ্ছে বসতিকারী বাঙালি এবং বাকি ২ লক্ষের মতো জনসংখ্যা পুরোনবস্তী বাঙালি, যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক 'অউপজাতীয় স্থায়ী অধিবাসী'[২] হিসেবে বিবেচিত।[৩] ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে পাহাড়ি-বাঙালি জনসংখ্যার অনুপাত যথাক্রমে ৫১.৪৩ শতাংশ ও ৪৮.৫৭ শতাংশ।[৪]

১৯৯১ সালের আদমশুমারির পর জাতিভিত্তিক কোনো সরকারি পরিসংখ্যান নেই। তাই ২০০১ সালে আদিবাসী পাহাড়িদের জাতিভিত্তিক জনসংখ্যা ও অন্যান্য তথ্যাবলি পাওয়া যায় না। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুসারে আদিবাসী পাহাড়িদের জনসংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

জাতিগোষ্ঠী	জনসংখ্যা	জাতিগোষ্ঠী	জনসংখ্যা	সর্বমোট
চাকমা	২৩৯,৪১৭	খিয়াং	১,৯৫০	
তঞ্চঙ্গ্যা	১৯,২১১	পাংখো	৩,২২৭	
মারমা	১৪২,৩৩৪	খুমী	১,২৪১	
ত্রিপুরা	৬১,১২৯	লুসাই	৬৬২	
ম্রো	২২,১৬১	চাক	২,০০০	
বম	৬,৯৭৮	অন্যান্য	৮২৮	
মোট	*৪৯১২৩০*		*৯৯০৮*	*৫০১,১৩৮*

ঐতিহাসিক পটভূমি

প্রাক-ঔপনিবেশিক আমলে এ অঞ্চলের পাহাড়ি জনগণ সামন্ত রাজার অধীনে স্বাধীন সার্বভৌমত্বের অধিকারী ছিল। ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্তচাকমা রাজ্যে বরাবরই একটা ধারাবাহিক শাসনব্যবস্থা কার্যকরভাবে চলে এসেছিল। এমনকি জাতীয় জীবনের চরম সংকটকালেও এ শাসনব্যবস্থা খুব বেশি ভেঙে পড়েনি। রাজস্ব আদায়, বিচার ও শাসনকার্য পরিচালনা এবং দেশরক্ষায় মূলত তালুকদার,

[২] পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩ নম্বর ধারায় উল্লেখ করা আছে যে, ''অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা' বলিতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণত বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।"

[৩] Indigenous Peoples' Human Rights Report in Asia 2008, Bangladesh-Burma-Lao, Towards Social Justice and Sustainable Peace, Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) Foundation, Chiang Mai, Thailand

[৪] Mapping Chittagong Hill Tracts Census Indicators, 2001 & Trends (Bangladesh), Geographical Information System (GIS) Unit, Local Government Engineering Department (LGED), Bangladesh, International Centre for integrated Mountain Development (ICIMOD), Nepal and Mountain Environment and Natural Resources Information Systems (MENRIS), April 2006, p-52

দেওয়ান, খীসা ও নায়েব প্রমুখরা রাজ প্রতিনিধি হিসেবে রাজাকে সহায়তা করত। কার্যত স্বাধীনতাপ্রিয় কিন্তু রাজভক্ত জনসাধারণ ছিল এ শাসনব্যবস্থার মূল শক্তি ও উৎস।

মোগল ও নবাবি আমলে বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রামসহ রাঙ্গুনিয়া, রাউজান ও ফটিকছড়ির বিস্তীর্ণ অঞ্চল কার্পাস বা তুলামহল হিসেবে পরিচিত ছিল। পার্শ্ববর্তী চট্টগ্রাম জেলার ব্যবসায়ীদের সাথে পার্বত্য এলাকার আদিবাসী পাহাড়িদের পণ্য বিনিময় ও ব্যবসা-বাণিজ্য করবার সুবিধা প্রদানের বিনিময়ে চাকমা রাজারা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ কার্পাস বা তুলা চট্টগ্রামের মোগল রাজপ্রতিনিধিকে প্রদান করতেন। এ 'কার্পাস শুল্ক' কোনো করদরাজ্যের কর ছিল না।

ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত চাকমা রাজা তথা আদিবাসী পাহাড়ি রাজন্যবর্গ এতদঞ্চলে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতা নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করে গেছেন। এ উপমহাদেশের প্রায় ৬০০ বছরের মোগল শাসনও এতদঞ্চলের আদিবাসী পাহাড়িদের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তার ক্ষেত্রে কোনো হুমকি সৃষ্টি করতে পারেনি বা করেনি। তাই এ যুগকে সুনির্দিষ্টভাবে পাহাড়ি জনগণের স্বাধীন ও সার্বভৌম যুগ বলা যায়।[৫]

সমগ্র ভারতবর্ষ দখলের এক পর্যায়ে ব্রিটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে নজর দেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে ব্রিটিশ শাসকরা পার্বত্য চট্টগ্রামে বেশ কয়েকবার অভিযান পরিচালনা করে। এক পর্যায়ে পাহাড়িদের অভিজাত শ্রেণির একটি সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তৎকালীন রাজা জানবক্স খাঁ দুর্বল হয়ে পড়েন এবং ১৭৮৭ সালের এক আক্রমণে পাহাড়িরা পরাজিত হলে ব্রিটিশদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটিশরা পার্বত্য অঞ্চলে জুমিয়া রাজাদের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে কোনো বড়ো ধরনের হস্তক্ষেপ করেনি এবং সামন্ত রাজারা অনেকটা স্বাধীনভাবে অভ্যন্তরীণ প্রশাসন চালিয়ে গেছেন বলা যেতে পারে।

১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে একটি জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বস্তুত ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে জেলা আইন প্রণয়নের এক যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর ভারতের ব্রিটিশ শাসকদের এ অভিজ্ঞতা হয় যে, ব্রিটিশ প্রণীত আইনকানুনের অধীনে সমতল তথা উন্নত এলাকা নিয়ে গঠিত জেলাসমূহের সাথে সমানতালে দুর্গম, অনগ্রসর ও পার্বত্য তথা আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোকে নিয়ে গঠিত জেলাসমূহ চলতে পারছে না। সমতল তথা উন্নত অঞ্চলে প্রচলিত আইন ও বিধানগুলো অনগ্রসর আদিবাসী অধ্যুষিত পার্বত্য এলাকায় কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যাচ্ছে না ঐতিহ্যগত, সাংস্কৃতিক ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে।

সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আদিবাসী জনগণ ও তাদের অধ্যুষিত অঞ্চল সমতল অঞ্চলের অধিবাসীদের থেকে ভিন্নতর। আদিবাসীরা এতই পশ্চাৎপদ যে তাদেরকে সমতলের অধিবাসীদের সাথে একই ধরনের শাসনাধীনে নিয়ে আসলে তারা নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে এবং উন্নততর সমতল অঞ্চলের অধিবাসীদের দ্বারা প্রতিনিয়ত

[৫] Chakma Resistence to British Domination, Suniti Bhushan Qanungo, Kanungopara, Chittagong, 1998

অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক প্রতারণা এবং বঞ্চনার শিকারে পরিণত হবে। তাই তাদের জন্য এমন এক পৃথক সহজ-সরল ও আত্মরক্ষামূলক শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন যা তাদেরকে তাদের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা বজায় রাখতে স্বাধীনতা দেবে এবং উন্নত প্রতিবেশীদের অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্ত রাখবে।[৬]

ব্রিটিশ ভারত সরকারের উক্ত উপলব্ধি থেকে ১৮৭৪ সালে ভারতীয় আইনসভা 'তফসিলভুক্ত জেলা আইন ১৮৭৪' পাস করে। এ আইন বলে বিশেষ অঞ্চলগুলোকে নির্দিষ্ট করে একটি তালিকা করা হয়। উক্ত তফসিলভুক্ত জেলা আইন-এর আওতায় অপরাপর বিভিন্ন জেলার সাথে পশ্চাৎপদ ও সম্পূর্ণ আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি তফসিলভুক্ত জেলায় পরিণত করা হয়।[৭]

এই এলাকার শাসন পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ও দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ আনয়নের জন্য ব্রিটিশ সরকার 'চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশন এ্যাক্ট ১৮৮১' প্রবর্তন করে। তারও পরে ১৯০০ সালের ১৭ জানুয়ারি পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি প্রবর্তন করে পাহাড়ি জনগণের পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখে। উক্ত শাসনবিধিতে বহিরাগত কোনো ব্যক্তির পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী বসতিস্থাপনের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল।

এরপরে ১৯১৯ সাল ও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনগুলোতেও উক্ত শাসনবিধি পুনরায় স্বীকৃতি প্রদান করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক শাসিত অঞ্চল ঘোষণা দেওয়া হয়।

পরবর্তী পাকিস্তান সরকারও ১৯৫৬ সালের সংবিধানে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি বলবৎ রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখে। ১৯৬২ সালে ঘোষিত পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধানেও 'উপজাতীয় অঞ্চল' শব্দ ব্যবহার করে বিশেষ অঞ্চলের মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়া হয়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাহাড়ি জনগণের ওপর বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্য ও বঞ্চনা অবসানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও স্বতন্ত্র নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে তৎকালীন সাংসদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরেন। কিন্তু জাতিরাষ্ট্রের উগ্র জাতীয়তাবাদে অন্ধ তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী পাহাড়ি জনগণের সেই দাবি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে। পাহাড়ি জনগণের ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। এমনি অবস্থায় সরকারও দমন-পীড়নের চরমপন্থা অবলম্বন করে। ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল পথ রুদ্ধ হলে পাহাড়ি জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন সশস্ত্র রূপ ধারণ করে।

প্রায় আড়াই দশক ধরে সশস্ত্র আন্দোলন অব্যাহত থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বরাবরই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা রাজনৈতিক উপায়ে ও সংলাপের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের পথ খোলা রাখে। তারই ফলে ১৯৮৫ সালে জেনারেল এরশাদ সরকারের সাথে আনুষ্ঠানিক সংলাপ শুরু হয়। জেনারেল এরশাদ সরকার ও পরবর্তী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের সাথে

---

[৬] প্রাগুক্ত

[৭] প্রাগুক্ত

সংলাপ প্রক্রিয়া ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের (১৯৯৬-২০০১) সাথে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনব্যবস্থা

ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠিত হয়। বাংলাদেশ শাসনামলে পার্বত্য জেলাকে বিভক্ত করে ১৯৮১ সালে বান্দরবান জেলা এবং ১৯৮৩ সালে খাগড়াছড়ি জেলা সৃষ্টি করা হয়। তিন পার্বত্য জেলায় তিন ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো রয়েছে। সারাদেশে বিদ্যমান জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রশাসনিক কাঠামো পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলায়ও সমভাবে বিদ্যমান রয়েছে। স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, পৃথক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ও সর্বোপরি আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় নিয়ে বিশেষ শাসন কাঠামোর অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রবর্তিত হয়েছে।

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক বিশেষ শাসন কাঠামোর অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রবর্তিত হয়েছে। সাধারণ প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন, ভূমি ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, পশুপালন, সংস্কৃতি, যুব উন্নয়ন, পরিবেশ ও সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত নয় এমন বনজ সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, উপজাতীয় রীতিনীতি ও আইন, জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিও কার্যাবলি ইত্যাদি আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের ওপর ন্যস্ত করা হয়। যদিও পরিষদগুলোর আইন মোতাবেক উল্লিখিত বিষয়গুলো এখনো কার্যকর না করা এবং সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসন কাঠামো এখনো কার্যকরভাবে গড়ে ওঠেনি।

এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্যাঞ্চলকে পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকার করে এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করা, পাহাড়ি জনগণের প্রথাগত ভূমি অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত একটি মন্ত্রণালয় গঠন ইত্যাদি বিশেষ বিধানও রয়েছে।

এছাড়া রয়েছে রাজা-হেডম্যান-কার্বারী সমন্বয়ে ঐতিহ্যবাহী প্রশাসনিক কাঠামো। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য ঐতিহ্যবাহী প্রশাসনিক ও বিচার কাঠামো রয়েছে। সার্কেলপ্রধান রাজা, মৌজাপ্রধান হেডম্যান ও গ্রামপ্রধান কার্বারীদের সমন্বয়ে এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান গঠিত। পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটি সার্কেল যথাক্রমে চাকমা সার্কেল, বোমাং সার্কেল ও মং সার্কেল রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচারব্যবস্থা

ব্রিটিশ আমল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলার বিচারব্যবস্থা দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও ব্যতিক্রমধর্মী। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিই এই স্বতন্ত্র বিচার ব্যবস্থার মূলভিত্তি। কিছু আগে পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি অনুসারে কোনো পৃথক সিভিল কোর্ট ছিল না। তিন পার্বত্য জেলা প্রশাসকই সিভিল কোর্টের দায়িত্ব পালন করতেন এবং ফৌজদারি মামলাগুলোর

বিচার করতেন। জেলা প্রশাসকদের এই সিভিল কোর্ট অন্যান্য জেলার জেলা জজকোর্টের সমতুল্য ছিল। আর সেসন জজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার। জেলা প্রশাসকের রায়ের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম বিভাগীয় আদালতে আপিল করা যেত।

বলাবাহুল্য এর পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী আদালতও বিদ্যমান রয়েছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রথাগত আইন মোতাবেক কার্বারী-হেডম্যান-রাজার আদালত মামলা নিষ্পত্তি করে থাকেন। গ্রামের 'কার্বারী' যাবতীয় ঝগড়া-বিবাদ বা নানারকম সমস্যার নিষ্পত্তি করে থাকেন এবং সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। কার্বারীর বিচার বা রায় মনঃপূত না হলে হেডম্যান আদালতে আপিল করা যায়। আবার হেডম্যানের বিচার বা রায়ের বিরুদ্ধে রাজা বা সার্কেল চিফের আদালতে আপিল করা হয়।

গত ২০০৭ সালে সারাদেশে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি সংশোধনের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলায়ও জজ আদালত স্থাপন করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম (সংশোধন) শাসনবিধি, ২০০৩ আইনের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের পরিবর্তে বিচার বিভাগ থেকে বিচারপতি নিয়োগ করার বিধান করা হয়েছে। এসব আদালতে আদিবাসীদের মামলাগুলো আদিবাসী প্রথাগত আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি করারও বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। আর এর পাশাপাশি আগের মতোই ঐতিহ্যবাহী বিচারব্যবস্থা বলবৎ রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

তিন পার্বত্য জেলার অধিবাসীদের মাথাপিছু আয় দেশের জাতীয় মাথাপিছু আয়ের অনেক নিচে। ২০০১ সালের আদমশুমারি ও অর্থনৈতিক জরিপ অনুসারে দেশের জাতীয় মাথাপিছু আয়ের তুলনায় ৪০ শতাংশের নিচে অবস্থান করছে তিন পার্বত্য জেলার অধিবাসীদের মাথাপিছু আয়। তবে উক্ত জরিপে আদিবাসী পাহাড়ি ও বাঙালি জনগোষ্ঠীর পৃথক কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আবহাওয়া ও মাটির বৈশিষ্ট্য জুমচাষের জন্য উপযোগী। জুমচাষের জন্য তুলনামূলকভাবে বিস্তর জায়গা প্রয়োজন। একবার চাষ করার পর উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য অন্তত ৫ থেকে ১০ বছর জমি অনাবাদি অবস্থায় রাখতে হয়। বিশেষত অধিকতর ফলন উৎপাদন ও উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য এটা অত্যন্ত প্রয়োজন। একসময় আদিবাসী পাহাড়িরা জুমচাষ থেকে সারাবছরের প্রয়োজনীয় খোরাকি যোগাড় করতে সক্ষম হতো। এমনকি পরিবারের ভরণপোষণের পর খাদ্য উদ্বৃত্ত থাকত। এছাড়া নদীবিধৌত উপত্যকা সমভূমিতে আদিবাসী পাহাড়িরা লাঙল চাষেরও পত্তন করে। জুমচাষ লাঙল চাষের সমন্বয়ে পাহাড়িরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তারা তাদের পরিধেয় কাপড়চোপড়, বেতের সামগ্রী, পরিবারের ব্যবহার্য জিনিসপত্র প্রভৃতি নিজেরাই তৈরি করত এবং সামাজিকভাবে সংরক্ষিত বন থেকে বাড়ি তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে পারত। কিন্তু আধুনিকতার

আগ্রাসনে ও কৃত্রিম সংকট উদ্ভবের কারণে পাহাড়িদের বর্তমানে অর্থনৈতিক চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে।[৮]

বিশ্ব খাদ্য সংস্থার খাদ্য ম্যাপিং-এর চিত্র অনুসারে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি খাদ্যঘাটতি অঞ্চল। এই একটা চিত্র থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের, বিশেষত আদিবাসী পাহাড়িদের অর্থনৈতিক দুর্দশার করুণ অবস্থা সম্পর্কে সহজেই অনুমান করা যায়। এর প্রধান কারণসমূহ হচ্ছে কতগুলো মনুষ্য-সৃষ্ট সমস্যা, যেমন— কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ, সমতল জেলা থেকে পার্বত্য চট্টগামে সরকারি উদ্যোগে বাঙালি বসতি প্রদান, পূর্ববর্তী সরকারসমূহের অপরিকল্পিত ও ওপর থেকে দেয়া চাপিয়ে দেয়া উন্নয়ন কার্যক্রম ইত্যাদি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বাজার অর্থনীতির আগ্রাসনের ফলে আদিবাসী পাহাড়িদের অর্থনৈতিক জীবনে যত না ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে, তারা চেয়ে বেশি পড়েছে নেতিবাচক প্রভাব। প্রথমত, আদিবাসী পাহাড়িরা ব্যবসায়িক অর্থনৈতিক কৌশল ও ছলচাতুরিতে ছিল অপরিচিত; দ্বিতীয়ত, তাদের সম্পত্তির মালিকানা ও ভূমির বাণিজ্যিক মূল্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাব; এবং তৃতীয়ত, অসাধু বাঙালি ব্যবসায়ীদের প্রতারণা ও সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি, যেটা কারণ হিসেবে প্রধান।[৯]

বিশ্বায়নের এই প্রবল আগ্রাসনে আদিবাসী পাহাড়িদের অর্থনৈতিক অবস্থা যেমনি প্রচণ্ডভাবে ভেঙে পড়েছে, তেমনি জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পাহাড়িরা অনেক নতুন পেশা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। আগেকার দিনের জুমচাষ ও লাঙল চাষের ক্ষুদে উৎপাদক পেশা থেকে বর্তমানে বিভিন্ন পেশায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে।

[৮] আদিবাসী জুম্ম জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা ও উন্নয়ন, মঙ্গল কুমার চাকমা, জুম পাহাড়ের জীবন, (মঙ্গল কুমার চাকমা, সোহরাব হাসান ও আবদুল আওয়াল সম্পাদিত), গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ঢাকা, মে ২০০৮

[৯] The Economy of the Indigenous Peoples of the Chittagong Hill Tracts: Some Myths and Realities by P B Chakma, Workshop on Development in the CHT organised by Forum for Environment and Sustainable development in the CHT, 1998

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি : উন্নয়ন ও সুশাসনের অভিযাত্রা

সংলাপ প্রক্রিয়া ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে সংলাপ ও আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালের অক্টোবরে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদের নেতৃত্বাধীন সরকারের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে পরিচিহ্নিত করে এবং রাজনৈতিক উপায়ে এর সমাধানের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছে। জেনারেল এরশাদ সরকারের সাথে ৬ বার, পরবর্তী সময়ে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের সাথে ১৩ বার এবং সর্বশেষ শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সাথে ৭ বার অর্থাৎ মোট ২৬ বার আনুষ্ঠানিক বৈঠকের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[১০]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা পার্বত্য শান্তিচুক্তি নামে সমধিক পরিচিত। এ চুক্তিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর করেন জাতীয় সংসদ কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক জনাব আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে স্বাক্ষর করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির প্রতি সমর্থন

এ চুক্তি দেশের সংবিধানের আওতায় ও অনুসরণে সম্পাদিত হয়েছে। অবহেলিত আদিবাসী পাহাড়ি জনগণ যাতে স্বীয় ভাষা-সংস্কৃতি তথা জাতীয় অধিকার সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয় এবং এ অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসীরা সর্বক্ষেত্রে উন্নতির মাধ্যমে সমতলবাসীদের সমকাতারে উপনীত হয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে তার বিধান এ চুক্তিতে রাখা হয়েছে। এ চুক্তি শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বার্থে নয়, সমগ্র দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নের লক্ষ্যেই সম্পাদিত হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণ বিপুলভাবে সমর্থন করে। এটি সমর্থন লাভ করে দেশ-বিদেশের অনাদিবাসী জনগণেরও। জাতিসংঘ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ মানবতাবাদী ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ এই চুক্তিকে স্বাগত জানায়। এই চুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘ ২৫ বছরের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংঘাতের অবসান ঘটে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের শান্তি ও উন্নয়নের সম্ভাবনাময়

[১০] পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অষ্টম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিশেষ ক্রোড়পত্র, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি : প্রেক্ষাপট, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, ২ ডিসেম্বর ২০০৫, দৈনিক প্রথম আলো। প্রাগুক্ত

ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়েছে।[১১] এই চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনেস্কোর ফেলিক্স হোপে-বৈহনি শান্তি পদকে (Félix Houphouët-Boigny Peace Prize) ভূষিত হন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরোধিতা

পাহাড়ি গণপরিষদ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের একটি অংশের নেতৃত্বে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ছাত্র-যুব সমাজের একটি অংশ এই অভিযোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে যে, এই চুক্তির মাধ্যমে পাহাড়ি জনগণের অনেক দাবি জলাঞ্জলি দেয়া হয়েছে। তারা পরবর্তী সময়ে ইউপিডিএফ নামে একটি সংগঠন গঠন করে 'পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন' আদায়ের ঘোষণা দেয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে এ সংগঠন জন্মলগ্ন থেকে নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে।

এদিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীসহ দেশের চরম দক্ষিণপন্থী জাতীয় রাজনৈতিক দলসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে। তারা এই চুক্তিকে দেশের সংবিধান ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী এবং দেশ বিক্রির শামিল বলে উল্লেখ করে।[১২] ২০০১-এ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসে চারদলীয় জোট পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাতিল না করলেও বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ নেয়নি। এ জোট চুক্তি বাস্তবায়নে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বৈশিষ্ট্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে চারটি খণ্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হয়। চার খণ্ডে বিবৃত চুক্তির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো হলো[১৩]

ক. সাধারণ

- পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাহাড়ি (উপজাতি) অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি ও এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধান করা হয়।
- সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলি ও রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজনের বিধান করা হয়।

---

[১১] *The Long Road to Peace in Chittagong, Raymundo D. Rovillos,* The Chittagong Hill Tracts, The Road to a Lasting Peace, Tebtebba Foundation, Bagio City, Philippines, 2000, p-13

[১২] `Life is not Our', Land and Human Rights in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, Update 4, The Chittagong Hill Tracts Commission, 2000

[১৩] Indigenous Peoples' Human Rights Report in Bangladesh, 2007-2008, Kapaeeng Foundation, Dhaka, July 2009

- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করার বিধান করা হয়।

খ. পার্বত্য জেলা পরিষদ

তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদকে পার্বত্য জেলা পরিষদ নামকরণ করে অধিকতর শক্তিশালীকরণের বিধান করা হয় এবং অন্যান্যের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সন্নিবেশ করার বিধান করা হয়—

- অউপজাতীয় (বাঙালি) স্থায়ী বাসিন্দা নির্ধারণ।
- সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান।
- স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়ন।
- কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করার বিধান এবং এতে জেলার পাহাড়িদের (উপজাতীয়) অগ্রাধিকার প্রদান।
- উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন।
- পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তার নিম্নস্তরের সকল সদস্য পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত করা ও জেলা পুলিশ পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন করা।
- পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতীত ভূমি ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর, অধিগ্রহণে বিধিনিষেধ।
- পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোনো আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিষদের বিশেষ অধিকার।
- আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন, কৃষি ও বন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, যুব কল্যাণ ও আদিবাসী (উপজাতীয়) প্রথাসহ ৩৩টি কার্যাবলি বা বিষয় (চুক্তিতে নতুন ১২টি বিষয়সহ) পরিষদের আওতাধীন করা।

গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করার বিধান করা হয় এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আওতাধীন করার বিধান করা হয়—

- পার্বত্য জেলা পরিষদের বিষয়াদির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়
- পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়
- সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃংখলা ও উন্নয়নের সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমসহ এনজিও কার্যাবলি সমন্বয় সাধন
- আদিবাসী (উপজাতীয়) আইন ও সামাজিক বিচার
- ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান
- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ওপর সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান
- ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ও অন্যান্য আইনের অসঙ্গতি দূরীকরণ
- অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন
- পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও পরামর্শক্রমে সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা।

ঘ. পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলি

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনস্থাপন এবং এই লক্ষ্যে পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবং বিষয়াবলির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করার বিধান করা হয়—

- ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি মোতাবেক পাহাড়ি শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন
- অভ্যন্তরীণ পাহাড়ি উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করে টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসন
- ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক পাহাড়ি পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করে দুই একর জমি বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করা।
- অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে ভূমি কমিশন গঠন এবং কমিশনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা।
- রাবার চাষ ও অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য বরাদ্দকৃত জমির ইজারা বাতিলকরণ।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা।
- চাকুরি ও উচ্চশিক্ষার জন্য পাহাড়িদের জন্য সরকারি চাকুরি ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখা।
- আদিবাসী (উপজাতীয়) কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান।
- জনসংহতি সমিতি সদস্যদের অস্ত্র জমাদান।
- জনসংহতি সমিতির সদস্য এবং সমিতির কাজে জড়িত পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা এবং তাদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত সকল মামলা প্রত্যাহার করা।
- জনসংহতি সমিতির সদস্যদের ঋণ মওকুফ, চাকুরিতে পুনর্বহাল ও পুনর্বাসন করা।

- সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলিকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া এবং এ লক্ষ্যে সময়-সীমা নির্ধারণ করা।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল প্রকার চাকুরিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাহাড়ি (উপজাতীয়) স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করা।
- জাতীয় পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা এবং এ মন্ত্রণালয়ে পাহাড়িদের মধ্য থেকে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করা ও মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করার জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও নারী সদস্যপদ সংরক্ষণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অন্যতম বিশেষত্ব হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে নারীদের জন্য সদস্যপদ সংরক্ষণ করা। জেনারেল এরশাদ কর্তৃক প্রবর্তিত ১৯৮৯ সালের তিন পার্বত্য জেলা সরকার স্থানীয় পরিষদে জাতিভিত্তিক আসন/সদস্যপদ সংরক্ষিত থাকলেও নারীর জন্য কোনো সংরক্ষিত আসন ছিল না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৪(ক) ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, 'প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩(তিন)টি আসন থাকিবে। এইসব আসনের এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্য হইবে।' তিনটি সংরক্ষিত নারী সদস্যপদের মধ্যে একটি সদস্যপদ স্থায়ী বাঙালি অধিবাসী নারী এবং দুইটি সদস্যপদ আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের জন্য সংরক্ষিত।[১৪]

আদিবাসী পাহাড়ি নারীর জন্য সংরক্ষিত সদস্যপদের ক্ষেত্রে জেলার বিভিন্ন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর জন্য কোটা থাকবে না বলে ১৯৯৮ সালের তিন পার্বত্য জেলা আইনে উল্লেখ রয়েছে।[১৫] এর ফলে আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের জন্য সংরক্ষিত দুইটি সদস্যপদে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা প্রভৃতি সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর নারীদের সাথে অন্যান্য স্বল্প জনসংখ্যাসম্পন্ন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর নারীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। এছাড়া পার্বত্য জেলা পরিষদে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ভিত্তিতে সংরক্ষিত সদস্যপদ নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। তাই আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর নারী সদস্যরা সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত সাধারণ সদস্যপদেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। অধিকন্তু পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে, যদিও এর বাস্তবচিত্র নারীদের জন্য অনুকূলে তা বলা যায় না।

উল্লেখ যে, ১৯৮৯ সালের তিন পার্বত্য জেলা সরকার পরিষদ আইন অনুসারে চেয়ারম্যানসহ ৩১ সদস্য নিয়ে প্রতিটি জেলা পরিষদ গঠনের বিধান রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক তিনটি

[১৪] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সমিতির স্বাক্ষরিত চুক্তি, ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭

[১৫] ১৯৯৮ সনের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার (সংশোধন) পরিষদ আইন (যথাক্রমে ৯, ১০ ও ১১ নম্বর আইন)।

সদস্যপদ নারীদের জন্য সংরক্ষণের ফলে প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য দাঁড়ায় চেয়ারম্যানসহ ৩৪ জন। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'গ' খণ্ডের ৩ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানসহ ২২ (বাইশ) সদস্যের পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে দুইটি সদস্যপদ পাহাড়ি নারীদের জন্য এবং একটি সদস্যপদ বাঙালি নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। পাহাড়ি নারী সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা জাতিগোষ্ঠী থেকে ১ জন এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী থেকে ১ জন নির্বাচিত হবে বলে চুক্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের সার্বিক অবস্থা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের অব্যবহিত পরে তৎকালীন সরকার কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কতিপয় আইন প্রণয়নসহ কিছু বিষয় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে এ চুক্তি বাস্তবায়নের মৌলিক ভিত্তি প্রস্তুত হয়েছে। এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন প্রণয়ন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থাপন, ভারত থেকে পাহাড়ি শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[১৬]

অভিযোগ রয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো, যেগুলোর ওপর পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করে ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠা, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইন কার্যকর করে অত্রাঞ্চলে বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করার মতো মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়ন নির্ভর করে, সেসব মৌলিক বিষয় বাস্তবায়নে তৎকালীন সরকার এগিয়ে আসেনি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মতে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন প্রণীত হলেও এসব এখনো যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়নি, ফলে বিশেষ শাসনব্যবস্থা এখনো কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি; এখনো সশস্ত্রবাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়নি, এমনকি পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহারের সময়সীমাও নির্ধারণ করা হয়নি। পক্ষান্তরে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে একপ্রকার সেনা কর্তৃত্ব জারি করা হয়। ভূমি কমিশন গঠিত হলেও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ শুরু হয়নি এবং ২০০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন প্রণীত হলেও পার্বত্য চুক্তির সাথে ১৯টি বিরোধাত্মক বিষয় সন্নিবেশ করা হয়। ভারত প্রত্যাগত পাহাড়ি শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা হয়নি, বরং চুক্তি লঙ্ঘন করে বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সার্কেল চীফের মাধ্যমে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের বিধান কার্যকর করা হলেও চুক্তি লঙ্ঘন করে জেলা প্রশাসককে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হয়। অস্থানীয়দের নিকট দেয়া ভূমি লীজ বাতিল করা হয়নি, বরং চুক্তি লঙ্ঘন করে নতুন লীজ প্রদান করা হয়। স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়ন না করে চুক্তি পরবর্তী সময়ে প্রণীত ভোটার তালিকায়

[১৬] পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অষ্টম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিশেষ ক্রোড়পত্র, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি : প্রেক্ষাপট, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, প্রথম আলো, ২ ডিসেম্বর ২০০৫

বহিরাগতদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়াও পার্বত্যাঞ্চলের সকল চাকুরিতে পাহাড়িদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করার বিধান কার্যকর হয়নি।[১৭]

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার (১৯৯৬-২০০১) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করলেও চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সেই সরকারের ভিতরকার একটি প্রভাবশালী কায়েমি স্বার্থান্বেষী মহল নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর ৩ বছর ৮ মাস সময় পেলেও চুক্তি বাস্তবায়নে আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট গোড়া থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরোধিতা করে আসছে। ১৯৯৭ সালে চুক্তি স্বাক্ষরের সময় তারা ঘোষণা দেয় যে, ক্ষমতায় গেলে এই চুক্তি তারা বাতিল করবে। ২০০১ সালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাপে আনুষ্ঠানিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাতিল না করলেও চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ রাখে। উপরন্তু চুক্তিকে নানাভাবে পদদলিত করে।

ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। জাতীয় পর্যায়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশংসনীয় সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও পূর্বেকার নির্বাচিত সরকারগুলোর মতো তত্ত্বাবধায়ক সরকারও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে চরম উদাসীনতা প্রদর্শন করে।

এদিকে বাম গণতান্ত্রিক দলগুলোসহ অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন রাজনৈতিক দলগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে সমর্থন করলেও চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তারা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করেনি, যদিও সভা-সমিতির বক্তব্যে ও কাগজপত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তারা বলিষ্ঠ সমর্থন জানিয়ে এসেছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেশের নাগরিক সমাজের একটি শক্তিশালী অংশ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে। এজন্য তারা নানাভাবে জনমত গঠনে ভূমিকা পালন করে চলেছে। পক্ষান্তরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পর্কে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনো অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। রাষ্ট্রের সিভিল ও সামরিক আমলাদের মধ্যে অধিকাংশের মধ্যেই এ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা বিরাজ করছে।[১৮]

২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার 'দিনবদলের সনদ'-এর ১৮.২ ধারায় স্পষ্টভাবে অঙ্গীকার করা হয়েছে যে, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়নে বর্ধিত উদ্যোগ, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, আদিবাসী ও

---

[১৭] Indigenous Peoples' Human Rights Report in Asia 2008, Bangladesh-Burma-Lao, Towards Social Justice and Sustainable Peace, Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) Foundation, Chiang Mai, Thailand

[১৮] বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের সার্বিক অবস্থা, মঙ্গল কুমার চাকমা ও পল্লব চাকমা, সংহতি ২০০৯, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ঢাকা, ৯ আগষ্ট ২০০৯।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি এবং তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ ও তাদের সুষম উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।'

নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুসারে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ইতোমধ্যেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কিছু কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা আশাব্যঞ্জক বলা যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগগুলো হচ্ছে গত ২৩ মার্চ ২০০৯ তারিখে চেয়ারম্যান পদে খাগড়াছড়ির এমপি যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরাকে নিয়োগের মাধ্যমে প্রত্যাগত পাহাড়ি শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স পুনর্গঠন করা, ১৯ আগস্ট ২০০৯ সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীকে আহ্বায়ক নিয়োগের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি পুনর্গঠন করা, ৩১ মার্চ ২০০৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে বান্দরবানের এমপি বীর বাহাদুর উশৈসিংকে নিয়োগ করা, ১৯ জুলাই ২০০৯ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন পুনর্গঠন করা, ২৯ জুলাই ২০০৯ এক ব্রিগেড সৈন্যসহ ৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের ঘোষণা ইত্যাদি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের আন্দোলন

পাহাড়ি জাতীয় সংগ্রামের সাথে নারীমুক্তি আন্দোলনের পদযাত্রা

১৯৬০ সালের শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রামের দশটি ভিন্ন ভাষাভাষী পাহাড়ি জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন সূচিত হয়। এ আন্দোলনের অগ্রদূত তথা জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জনসংহতি সমিতির ইশতেহারে নারী-পুরুষের বৈষম্যহীন ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছেন। একাধারে পারিবারিক জীবনে পুরুষের আধিপত্য এবং জাতীয় জীবনে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার চরম শিকার পাহাড়ি নারীসমাজের মধ্যে এই দ্বৈত অত্যাচার নিপীড়নের মধ্যেও এম এন লারমা এক দুর্বার সংগ্রামী শক্তি প্রত্যক্ষ করতেন। পাহাড়ি নারীসমাজকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করার অপরিহার্যতা তিনি গভীরভাবে অনুভব করতেন।

সত্তর দশকে পাহাড়ি নারীসমাজকে পুরুষদের আধিপত্য ও পারিবারিক দাসত্ব থেকে মুক্তির মহান প্রয়াসে অধিকার সচেতন করে সংগঠিত করবার রাজনৈতিক প্রয়াস গড়ে ওঠে। রাজনৈতিকভাবে উপলব্ধ হয় যে, সমাজের অর্ধেক অংশই নারী। এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে অধিকার সচেতন করে উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে জাতীয় অগ্রগতি ত্বরান্বিত হতে পারে না।

নারীসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই প্রকৃত নারীমুক্তির পথ উন্মুক্ত হতে পারে। অতএব উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনসহ পাহাড়ি জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে পাহাড়ি নারীসমাজকে শামিল করার উদ্যোগ গ্রহণ শুরু হয়। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচারণার মধ্য দিয়ে পাহাড়ি নারীসমাজকে রাজনৈতিক সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ ও শামিল করার প্রচেষ্টা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে পাহাড়ি নারী জাগরণ সংঘবদ্ধ ও জোরালোভাবে শুরু হয়।

পাহাড়ি নারীদের সংগঠিত করে একটি শক্তিশালী নারী সংগঠন গঠনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে। ১৯৭৩ সালের প্রারম্ভে এক পর্যায়ে মহিলা সংগঠনের ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে অগ্রগামী পাহাড়ি নারীদের নিয়ে একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হতে থাকে। অবশেষে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫-এ 'পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি' নামে পাহাড়ি নারীদের একটি নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে।[১৯]

পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির ইশতেহারে বলা হয়েছে যে— পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজব্যবস্থা মূলতঃ সামন্ততান্ত্রিক পিতৃপ্রধান মতাদর্শ ও ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের নারী জাতি সামন্তবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক শাসন, শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন ছাড়াও পুরুষদের দ্বারা শাসিত হওয়ার ফলে অকথ্য নির্যাতন, নিপীড়ন ও অমানুষিক অত্যাচার ভোগ করতে বাধ্য হচ্ছে। নারীজাতি পরনির্ভরশীল হওয়াতে সমাজ জীবনে অপাংক্তেয়, অবহেলিত ও ভোগ্যবস্তু হিসেবে বিবেচিত

[১৯] বিশ্ব নারী আন্দোলন ও জুম্ম নারীসমাজ, জড়িতা চাকমা, জাগরণ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন-এর ৬ষ্ঠ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ২০০৪ স্মারক সংখ্যা, (মেঞোচিং মারমা সম্পাদিত), হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙ্গামাটি, ২০ নভেম্বর ২০০৪

হয়ে আসছে। অথচ নারী ও পুরুষ যদি সম্মিলিতভাবে সংগ্রামমুখী না হয় তাহলে সমাজ জীবন হতে সকল প্রকারের শোষণ ও ভেদাভেদ নির্মূল করার কোন কল্পনাই করা যায় না। নারীর সৃজনী প্রতিভা ও সংগ্রামী ভূমিকা যে পুরুষের সংগ্রামী জীবনে অপরিহার্য এ কথা বিশ্বের দেশে দেশে বার বার প্রমাণিত হয়েছে। পুরুষের পাশাপাশি নারী জাতিকে অগ্রসর করতে না পারলে কোন দেশ বা জাতিকে সকল প্রকারের জাতিগত ও শ্রেণীগত অন্যায় শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত করা অসম্ভব। তাই নারী জাতিকে দেশ ও জাতির উন্নয়নকল্পে ও গঠনমূলক সংগ্রামে অংশীদার করানোর মাধ্যমে বিশ্বের নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা পালন করার পূর্ণ সুযোগ উন্মুক্ত করে দিতে হবে।[২০]

পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির গঠনতন্ত্র প্রণীত হয় ১৯৭৫ সালে। গঠনতন্ত্র মোতাবেক এই সংগঠনের প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয় ১০ আগস্ট ১৯৭৫-এ। চেঙ্গী, মাইনী, কাচালং অঞ্চল থেকে আগত মোট ৬৫ জন মহিলা প্রতিনিধি এ সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে শ্রীমতী মাধবীলতা চাকমাকে সভানেত্রী, শ্রীমতী জয়শ্রী চাকমাকে সাধারণ সম্পাদিকা, শ্রীমতী দিপ্তী চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদিকা ও শ্রীমতি জড়িতা চাকমাকে সাংস্কৃতিক ও প্রচার সম্পাদক করে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির একটি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। এই কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে মাইনী, চেঙ্গী ও কাচালং অঞ্চলে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির ৩(তিন)টি আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা হয়। ক্রমান্বয়ে এই আঞ্চলিক কমিটিসমূহের নেতৃত্বে তৃণমূল পর্যায়ে বহু গ্রাম কমিটি গঠন করা হয়।

সশস্ত্র আন্দোলনে পাহাড়ি নারীর অংশগ্রহণ

১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি নারীসমাজের জন্য আরো একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা হয়। ওইসময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সদস্যদের প্রথম রাজনৈতিক ও সামরিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয় জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। ৩৫ জন সদস্য ওই প্রশিক্ষণে অংশ নেন। রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সামরিক প্রশিক্ষণ কোর্সও শুরু হয়েছিল। পাহাড়ি নারীদের এটাই প্রথম সামরিক প্রশিক্ষণ। এই সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল যুদ্ধ পরিস্থিতিতে নিছক আত্মরক্ষার জন্যই। সম্মুখ সমরে শত্রুর মোকাবিলা করার পরিকল্পনা এতে যুক্ত ছিল না। সব মিলে সশস্ত্র আন্দোলন পর্যায়ে এই রাজনৈতিক ও সামরিক প্রশিক্ষণ বিশেষ কাজে লেগেছিল। বাইরে গণসংগঠন গড়ে তোলা, শত্রু ও প্রতিক্রিয়াশীলদের ধোঁকা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ, সর্বোপরি কর্মীবাহিনীর নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছিল।[২১]

পাহাড়ি নারীমুক্তি আন্দোলনের এই অগ্রযাত্রা কিন্তু সহজ সরল পথে এগোয়নি। নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে এগোতে হয়েছে। রক্ষণশীল জুম্ম সমাজ নারীসমাজের এই বহির্মুখী পদচারণা সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। সমাজসদস্যদের নানা কটূবাক্য ও উপহাস এসব পাহাড়ি নারীকর্মীদের শুনতে হয়েছে। নারীকর্মীদেরকে নানা অভিধায় আখ্যায়িত হতে হয়েছে। মাতাপিতা,

---

[২০] পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির গঠনতন্ত্র ১৯৭৫

[২১] নারীমুক্তি প্রসঙ্গে এম এন লারমা, শ্রীমতি পল্লবী, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা : জীবন ও সংগ্রাম, (মঙ্গল কুমার চাকমা সম্পাদিত), এম এন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন, রাঙ্গামাটি, ফেব্রুয়ারি ২০০৯

অভিভাবক, স্বামী, সর্বোপরি পুরুষের নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও সামন্ত সমাজের প্রতিক্রিয়াশীলতা ও রক্ষণশীলতা উপেক্ষা করে অত্যন্ত সুকৌশলে নারীরা রাজনৈতিক আন্দোলনে সমবেত হতে থাকে।

সশস্ত্র আন্দোলনের গতি যতই জোরদার হতে থাকে শাসকগোষ্ঠীর দমন পীড়নের মাত্রাও তত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৭৬ থেকে সশস্ত্র আন্দোলন জোরদার হলে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে হাজার হাজার সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য নিয়োগ করতে থাকে। ফলে সশস্ত্র বাহিনীর দমন-পীড়ন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত সরকার সামরিক কার্যক্রমের সাথে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠন গড়ে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলন ভেস্তে দেয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়। এ সময় নারীকর্মীদের নিরাপত্তা ও চলাফেরা এবং মহিলা সমিতির কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এর ফলে আন্দোলনের এক পর্যায়ে মহিলা সমিতির কার্যক্রমের ক্ষেত্র ধীরে ধীরে সীমিত হতে থাকে। এমতাবস্থায় সমিতির কাজকর্ম পার্টির কর্মী পরিবারসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

নারী আন্দোলনের অন্যতম নেতা বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য মাধবীলতা চাকমা বলেন, সত্তর দশকে যে নারী জাগরণের উত্তাল ঢেউ পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে কানাচে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, তার ফলে পাহাড়ি নারীর মুক্তি বা অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। পাহাড়ি নারীসমাজের এক ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে অধিকার সচেতনতা এবং কঠোর সংগ্রামী প্রত্যয় সৃষ্টি হবার পেছনে এটা একটা বড়ো কারণ।

সশস্ত্র আন্দোলনের সময় বহু পাহাড়ি নারী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গুপ্ত সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেছে এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা শ্লীলতাহানি, নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হয়েছে। প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও পাহাড়ি নারীরা সংঘাতকালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নারীরা বিশেষ করে যোদ্ধাদের জন্য তথ্য, চিঠিপত্র ও অন্যান্য গোপন দলিল বহনের ব্যাপারে সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা যুগিয়েছে। তাছাড়া তারা খাদ্য সরবরাহ, আহতদের সেবাশুশ্রূষা দান ও বিনা পারিশ্রমিকে বস্ত্র তৈরি করে দেয়ার মাধ্যমেও অবদান রেখেছে। বিদ্রোহকালে আদিবাসী নারীরা বিপুল পরিমাণ ভূমিকা পালন করলেও তারা জাতীয়ভাবেও পুরস্কৃত হয়নি, তাদের নিজেদের সমাজ থেকেও আনুষ্ঠানিক কোনো স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। বিদ্রোহী তৎপরতায় আদিবাসী নারীদের ভূমিকা বহুলাংশে অদৃশ্যমানই রয়ে গেছে।[২২] জনসংহতি সমিতির অস্ত্র জমাদানকারী সদস্যদের তালিকায় একমাত্র মাধবীলতা চাকমা ব্যতীত অন্য নারীকর্মীদের ঠাঁই হয়নি। ফলে তারা সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হয় বলে অনেক নারীকর্মী অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

[২২] *Women's Survival and Ressitance*, Meghna Guhathakurta, The Chittagong Hill Tracts and Nature at Risk, Philip Gain (ed.), Society for Environmont and Human Development (SEHD), Dhaka, 2000.

গণআন্দোলনে পাহাড়ি নারী

পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষাপটেও পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি নানা কৌশল অবলম্বন করে স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সদা সচেষ্ট ও সক্রিয় রয়েছে। এর পাশাপাশি সত্তর দশকের পাহাড়ি নারীসমাজের জাগরণের ধারাবাহিকতা হিসেবে ১৯৮৮ সালের ৮ মার্চ গৌরি চাকমা ও শিলা চাকমার নেতৃত্বে হিল উইমেন্স ফেডারেশন নামে আরেকটি নারী সংগঠন আত্মপ্রকাশে সক্ষম হয়ে ওঠে। জন্মলগ্ন থেকেই হিল উইমেন্স ফেডারেশন পাহাড়ি গণ পরিষদ ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পাশাপাশি গণতান্ত্রিকভাবে তার কার্যক্রম শুরু করে। মহাবিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তারা সংগঠন গড়ে তোলে।

১৯৯৫ সালের ১৫ জানুয়ারি এই সংগঠনের প্রথম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তখন থেকেই এই নারী সংগঠন নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পাহাড়ি নারীসহ পাহাড়ি জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে আসছে। বাংলাদেশ সরকারের সামরিক সন্ত্রাসের দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি নারী জাতির ওপর যে নির্যাতন-নিপীড়ন চলছে, তার বিরুদ্ধেও এই সংগঠন দেশে বিদেশে সোচ্চার হয়ে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে তৎপর রয়েছে।

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর থেকে হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পার্বত্য চট্গ্রাম মহিলা সমিতি পাহাড়ি নারীসমাজকে সংগঠিত করা এবং পাহাড়ি নারীর ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে এই উভয় নারী সংগঠনই জোরালো ভূমিকা পালন করে চলেছে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পাহাড়ি নারী

১৯৯৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর থেকে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলনে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের দুই সদস্য একটি বেসরকারি প্রতিনিধিদলে যোগ দিয়ে পাহাড়ি নারীদের অবস্থার কথা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন। তারা বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত নারী সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়ি নারীর প্রতিনিধিত্ব করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের পক্ষে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। পার্বত্য চুক্তির পর জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের অধীনে অধুনাবিলুপ্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ, আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক খসড়া ঘোষণাপত্র সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ ও মানবাধিকার সাব-কমিশনের অধিবেশনে অনেক পাহাড়ি নারী যোগদান করেন। এর ফলে মানবাধিকার এবং বিশেষ করে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া বিষয়ে অনেক আদিবাসী পাহাড়ি নারী অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হন।

এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত মানবাধিকার, বিশেষ করে আদিবাসী অধিকার, আদিবাসী নারী অধিকার সংক্রান্ত সম্মেলন, সেমিনার, প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আদিবাসী নারী অধিকার কর্মীদের যোগদান করার সুযোগ হয়েছে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর গড়ে ওঠা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয়

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে অনেক আদিবাসী পাহাড়ি নারীই এসব আন্তর্জাতিক ফোরামে যোগদান করেন। সীমিত পর্যায়ে হলেও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আদিবাসী নারীর অংশগ্রহণ আদিবাসী পাহাড়ি নারীর অধিকার সচেতনতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের আদিবাসী নারী সংগঠনের সাথে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, আদিবাসী পাহাড়ি নারীর ওপর চলমান সাম্প্রদায়িক সহিংসতা প্রতিরোধ জোরদার করা, সহিংসতা প্রতিরোধে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি ঘটেছে বলে আদিবাসী পাহাড়ি নারীকর্মীরা দাবি করেছেন। এটা অনেকটা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ফলে অর্জিত অনুকূল পরিবেশের কারণে সম্ভব হয়েছে বলে তারা দাবি করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী নারী সংগঠনের পদচারণা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারি উন্নয়নের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়নের ক্ষেত্র হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিত্তিক স্থানীয় বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (এনজিও) গড়ে ওঠে। তারই অংশ হিসেবে অনেক বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী নারী সংগঠনও পার্বত্য চট্টগ্রামে জন্মলাভ করে। এসব নারী সংগঠন নারীসমাজের সক্ষমতা গড়ে তোলা, তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা, নারীশিক্ষার প্রসার, নারীর স্বাস্থ্যসেবা ও পরিচর্যা, নারীর কর্মসংস্থান, গ্রামীণ দুস্থ নারীদের আয়বর্ধনমূলক ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে উৎসাহিত করা, পাহাড়ি নারীর ওপর চলমান পারিবারিক, সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা ইত্যাদি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

এক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের অনেক নারী সংগঠনও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী নারী সংগঠনসমূহকে সহায়তা প্রদান এবং অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একযোগে কাজ করতে এগিয়ে আসে। বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, নারীপক্ষ, দুর্বার নারী নেটওয়ার্ক, নিজেরা করি ইত্যাদি জাতীয় নারী সংগঠন এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ নিজেরা সরাসরি না করে স্থানীয় সংগঠনের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে, যাতে স্থানীয় সংগঠনগুলোর সক্ষমতা গড়ে ওঠে। জাতীয় ও স্থানীয় নারী সংগঠনগুলোর এসব কাজ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

আদিবাসী নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

সাধারণভাবে রাজনীতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়ি নারীর অংশগ্রহণ এখনো ব্যাপক নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জনগণ যখন অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে জড়িত হয়ে পড়ে, তখন ১৯৭৫ সালে জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি গঠিত হয়। এ সমিতির সদস্যরা জনসংহতি সমিতির পরিচালনাধীনে নারীদের সচেতন ও সংগঠিত করে এবং পুরুষদের মদ-জুয়ার ব্যবহারসহ নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। ৯০ সালের গোড়ার দিকে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের জন্ম হয়। বেশির ভাগ স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা এই সংগঠনের সাথে জড়িত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আগে থেকেই বিরাজমান পরিস্থিতিতে নারীর ওপর সহিংসতার বিরুদ্ধে সোচ্চার রয়েছে এই সংগঠন। তৎকালীন সময়ে নারীরা আর্ন্তজাতিক ফোরামে অংশগ্রহণ করে তাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।

রাজনীতিতে আদিবাসী পাহাড়ি নারীর সীমিত অংশগ্রহণের কারণ হিসেবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধা অন্যান্য অনেক কারণের অন্যতম। এছাড়াও পৃষ্ঠপোষকতার অভাব আর জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোতে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের আধিপত্যের কারণে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ কম।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরও আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মৌলিক কোনো অগ্রগতি ঘটেনি। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল আদিবাসী পাহাড়ি নারীকর্মীদের রাজনৈতিক শিক্ষার ওপর প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এতে রাজনৈতিক শিক্ষায় নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি পায় ও নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়, যা ভবিষ্যতে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।[২৩]

সংবিধান, রাষ্ট্রীয় নীতি ও আদিবাসী পাহাড়ি নারী

সংবিধান

বাংলাদেশের সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষী ১১টি আদিবাসী পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীর কোনো স্বীকৃতি নেই। তবে সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।" উক্ত দফায় বর্ণিত "নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের" মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী বা সরকারি ভাষায় উপজাতি জনগোষ্ঠীসমূহকেও সরকারিভাবে নির্দেশ করা হয়। এই অনুচ্ছেদ বলে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়িসহ দেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর জন্য কতিপয় ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং ১৯৯৭ সালে জনসংহতি সমিতির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদন করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা

[২৩] পার্বত্য নারীর পাঁচমিশেলী গপ্‌পো, টুকু তালুকদার, জাগরণ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস সংখ্যা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি, রাঙ্গামাটি, ৮ মার্চ ২০০৫

হয়েছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত ইতিবাচক পদক্ষেপের সুফল আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে আদিবাসী নারীরাও কিছু কিছু ক্ষেত্রে লাভ করছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই নারী সদস্যরা ৩০০ জন সাধারণ সংসদ সদস্যের ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকে। জাতীয় সংসদে যাতে ন্যূনতম সংখ্যক নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায় এবং ধীরে ধীরে যাতে নারীরা নির্বাচনের মূলধারায় প্রবেশ করতে পারে, তজ্জন্য সংরক্ষিত আসনের বিষয়টি ১৯৭২ সালে প্রবর্তন করা হয়। প্রত্যাশা ছিল, এর মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর সমঅংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করে এমন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা ভবিষ্যতে দূরীভূত হবে এবং পুরুষের পাশাপাশি নারীরও অধিক মাত্রায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হবে। কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষা বাস্তবরূপ লাভ করেনি। দেশের রাজনৈতিক দলগুলো থেকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন নারীই শুধু দলীয় মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পাচ্ছে। সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে এই বিধানটি এ যাবৎ তিনবার নরায়ন করা হয়।

১৯৭২ সালের সংবিধানের ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে দশ বছর মেয়াদের জন্য ১৫টি সংরক্ষিত আসনের বিধান রাখা হয়। এরপর ১৯৭৮ সালে প্রথম বার সংরক্ষিত আসনের বিধান নবায়ন করা হয়। ১৯৭৮ সালে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ ১৫ বছর করে আসন সংখ্যা ৩০-এ উন্নীত করা হয়, যা ১৯৮৭ সালে শেষ হয়ে যায়। এরপর ১৯৯০ সালে দ্বিতীয় বার নবায়ন করা হয়। ১৯৯০ সালে সংবিধানের দশম সংশোধনীতে দশ বছর মেয়াদের জন্য ৩০টি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল, যা ২০০১ সালের জুলাই মাসে শেষ হয়ে যায়।[২৪] এরপর বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের আমলে ২০০৪ সালের ৪ মে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ তৃতীয় বার নরায়ন করা হয়। তৃতীয়বার নবায়নের সময় নারীদের সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৪৫টি করা হয় এবং জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিত্বের আনুপাতিক হারে ৪৫টি আসনে সরাসরি মনোনয়নের বিধান করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর ২০০৪ সালে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ তৃতীয় বার নরায়ন করা হলেও এক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের স্বতন্ত্র প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নেয়া হয়নি। ফলে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের জন্য (পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরও) স্বতন্ত্রভাবে কোনো আসন সংরক্ষণ করা হয়নি।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি

বাংলাদেশ নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি (সিডও) স্বাক্ষর করে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৮ সালে। অন্যদিকে নারীদের জন্য প্রয়োজনবোধে বিশেষ আইন প্রণয়নের উল্লেখ করা হয়েছে সংবিধানের ২৮(৪) ধারায়।

---

[২৪] নারী অধিকার ও জুম্ম নারী সমাজ : মানবাধিকারের প্রেক্ষিত, উদয়ন চাকমা, জাগরণ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস সংখ্যা, (অরুমিতা চাকমা ও সিংকো চাকমা সম্পাদিত), পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙ্গামাটি, ৮ মার্চ ২০০৩

পুরুষের পাশাপাশি নারীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার ১৯৪৮ সালে ঘোষিত জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র এবং ১৯৯৫ সালে ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত বেইজিং ঘোষণাপত্রে স্বীকৃত হয়েছে। জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র এবং বেইজিং প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন-এ স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সর্বক্ষেত্রে নারীরা যাতে দেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পুরুষের মতো সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য। বাংলাদেশের সংবিধানে জাতি, ধর্ম ও লিঙ্গভেদে বৈষম্য না করা এবং নারী-পুরুষের সমানাধিকারের বিধান অনেক অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এসব বিষয়সমূহ কেবল কাগজপত্রে বিধৃত রয়েছে। বস্তুত বাস্তবিক ক্ষেত্রে তার কোনো প্রয়োগ অনুপস্থিত।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি উত্তরকালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২০০৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বর আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়েছে। উক্ত ঘোষণাপত্রে আদিবাসী নারীর নিরাপত্তা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিপীড়ন ও বৈষম্য থেকে সুরক্ষা ও মুক্তির বিধান থাকলেও বাংলাদেশ সরকার দেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহকে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অব্যাহতভাবে অস্বীকার করে চলেছে। তারই অংশ হিসেবে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্রে আদিবাসী নারীর স্বীকৃত অধিকারও অস্বীকার করে চলেছে।

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও নারী ও পুরুষের মধ্যে সাম্য এবং বৈষম্যহীনতা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন করেছে। এ ধরনের কতিপয় ব্যবস্থা বাংলাদেশের জাতীয় সংবিধানেও সন্নিবেশিত আছে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ আইএলও'র আদিবাসী ও ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠী কনভেনশন (১০৭ নম্বর কনভেনশন) অনুস্বাক্ষর করেছে। আইএলও'র এই কনভেনশন বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করলেও একের পর এক সরকার এই কনভেনশন বাস্তবায়নে উদাসীনতা প্রদর্শন করে চলেছে। এর ফলে উক্ত কনভেনশনে স্বীকৃত আদিবাসী নারীর অধিকার উপভোগের ক্ষেত্রে আদিবাসী পাহাড়ি নারীসমাজ বঞ্চিত হয়ে চলেছে। উপরন্তু আইএলও'র উক্ত কনভেনশন মূলত বৃহত্তর জনসমষ্টির সাথে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে একীভূতকরণের ঔপনিবেশিক ধারণা পোষণ করে। এই ঔপনিবেশিক প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা পরিহার করে আইএলও ১৯৮৯ সালে অধিকতর প্রগতিশীল কনভেনশন "আদিবাসী ও ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠী কনভেনশন (১৬৯ নম্বর কনভেনশন)" গ্রহণ করেছে। উক্ত কনভেনশন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র জাতীয় পরিচয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট সমুন্নত রেখে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন ধারণার স্বীকৃতি দিয়েছে। পাশের দেশ নেপাল উক্ত কনভেনশনে অনুসমর্থন প্রদান করলেও বাংলাদেশ এখনো অনুসমর্থন প্রদান করেনি। আদিবাসী পাহাড়ি নারীর রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠাপোষকতার অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এই অনুসমর্থন না করাটাও একটা বাধা হিসেবে কাজ করে।

সাধারণভাবে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী সমতল অঞ্চলের বাঙালি নারীরা যেসব বৈষম্যের শিকার হয় বলে জানানো হয়েছে, আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের ক্ষেত্রেও সেগুলো সমভাবে প্রযোজ্য এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈষম্য আরো বেশি। যেহেতু সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত অনেকটাই পৃথক, সেহেতু এসব আইন আদিবাসী নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য প্রতিরোধের জন্য যথোপযুক্ত নয়। এজন্য প্রয়োজন আরো বিশেষায়িত আইন। নীতির এই অপর্যাপ্ততার বিষয়টি নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার

জাতীয় পর্যায়ের আলোচনায় খুব কমই স্বীকার করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ সিডওর ক্ষেত্রে বলা যায়, এতে আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়েছে। উপরন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে অসম সুযোগ, মজুরি ও স্বাস্থ্যসেবার বৈষম্য, সহিংসতা, মানবাধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদি বিষয় সিডও সঠিকভাবে পরিচিহ্নিত করেছে। কিন্তু পশ্চিমা সংস্কৃতির মৌলিক পক্ষপাতিত্ব, যা উত্তরাধিকার সূত্রে সিডওর মধ্যে প্রোথিত, তাই সে সম্পর্কে সিডও আলোকপাত করতে ব্যর্থ হয়েছে বলা যায়। এই নীতি আদিবাসী নারীদের ওপর চলমান বৈষম্য বরং অব্যাহত রেখেছে। তাই বাংলাদেশ সরকার ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থাসমূহ কর্তৃক যেকোনো নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে আদিবাসী সংস্কৃতি, এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ও তথ্যাদির স্বীকৃতি প্রদান করা অত্যাবশ্যক বলে নারী অধিকার কর্মীদের অভিমত।

নারী অধিকার সংরক্ষণের স্বার্থে ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীকালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় এলে এই নীতির আংশিক সংশোধন করা হয়। আবার ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নতুন করে নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষিত হয়। সর্বশেষ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ৯৭-এর নীতিটিরই পুনর্বহালের ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ঘোষণার পর জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি একাধিকবার সংশোধিত ও গৃহীত হলেও চুক্তির মূল চেতনা এবং আদিবাসী নারীদের স্বতন্ত্র প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নেয়া হয়নি। কারণ আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের অধিকার এই নীতিতে স্বতন্ত্রভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বিভিন্ন ধারায় সমনাধিকারের কথা বলা হয়েছে, যেমন কর্মরত অবস্থায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যায় নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা; শিক্ষাক্ষেত্রে নারী ও মেয়েশিশুর সমান অধিকার নিশ্চিত করা; সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায়ে নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেওয়া কিংবা পরিবেশ সংরক্ষণের নীতি ও কর্মসূচিতে নারীর সমান অংশগ্রহণের সুযোগ ও নারী প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা ইত্যাদি। এছাড়া জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারীর যে সমান অধিকার রয়েছে, তার স্বীকৃতিস্বরূপ সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অন্যান্য জাতীয় পর্যায়ের সেক্টরাল নীতিগুলোর মতোই এই জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতেও আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিষয়ে তথা আদিবাসী নারীসমাজের বিষয়ে কোনো কিছুরই উল্লেখ নেই। অথচ দেশের নারীসমাজের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রান্তিক ও ভঙ্গুর অংশ হচ্ছে আদিবাসী নারীসমাজ।[২৫]

বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৃতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভূমি ও সম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আদিবাসী পাহাড়ি নারীরা একদিকে আদিবাসী হিসেবে সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিগত নিপীড়নের শিকার হচ্ছে, অপরদিকে নারী হিসেবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের শাসন-শোষণে নির্মমভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছে। তাই দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নারীসমাজের চেয়ে আদিবাসী নারীসমাজকে দ্বিগুণ

[২৫] ১৮ জুলাই ২০০৮ ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন কর্তৃক "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি : আদিবাসী নারী অধিকার" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় পঠিত প্রবন্ধ।

শোষণ-বঞ্চনার শিকার হতে হয়। অথচ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে সেই দ্বিগুণ শোষণ-বঞ্চনায় নিষ্পেষিত আদিবাসী নারীসমাজের কথা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে।

আদিবাসীদের এই স্বতন্ত্র প্রেক্ষাপট জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা না হলে আদিবাসীদের প্রকৃত ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন কখনোই সম্ভব হতে পারে না। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে সাধারণীকরণের মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের দারিদ্র্যের পেছনে অন্তর্নিহিত কারণসমূহের মূলোৎপাটন করা সম্ভব হতে পারে না বলে আদিবাসী পাহাড়ি নারীরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তেমনিভাবে দেশের সেক্টরভিত্তিক সাধারণ জাতীয় নীতিমালার মধ্য দিয়ে দেশের অবহেলিত বৃহত্তর নারীসমাজের ওপর বিদ্যমান বৈষম্য অবসান করা সম্ভব নয় বলে তারা জানান।

পরিবার ও সমাজে তাদের প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও নারীরা জাতীয় আন্দোলনে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছে নিষ্ঠার সাথে। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কোনো মূল্যায়ন হয় না, স্বীকৃতি নেই তাদের অবদানের। বিশ্ব জুড়ে তাই আজ দাবি উঠেছে আদিবাসী নারীদের সকল পর্যায়ে অংশীদারত্বের। বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিসহ জাতীয় পর্যায়ের সকল প্রকারের নীতিতে আদিবাসীদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বিধান সন্নিবেশ করা প্রয়োজন। নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আদিবাসী নারীদের সকল প্রকার বৈষম্যের বেড়াজাল থেকে রক্ষা করার জন্য জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে আদিবাসী নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত থাকা অত্যন্ত জরুরি বলে আদিবাসী পাহাড়ি নারী নেতৃবৃন্দ অভিমত জানিয়েছেন।[২৬]

জাতীয় সংসদে আদিবাসী পাহাড়ি নারী

বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর জন্য ৪৫টি সংরক্ষিত আসন বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই নারী সদস্যরা সংসদের সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে ৩০০ জন সাধারণ সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকে। উক্ত নারী আসনে আদিবাসী নারীর প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর সর্বশেষ ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেখা যায় যে, মোট ৮টি রাজনৈতিক দল ৫০ জন নারীকে সরাসরি নির্বাচনে প্রার্থিতা প্রদান করে। তন্মধ্যে একমাত্র বিএনপি কর্তৃক রাঙ্গামাটি আসনে একজন আদিবাসী পাহাড়ি নারীকে (মৈত্রী দেওয়ান) প্রার্থিতা প্রদান করা হয়। এই প্রার্থিতা দেয়া হয় তাঁর স্বামী দীপেন দেওয়ান সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিন বছর পূর্ণ না হওয়ায় সংসদ নির্বাচনে দাঁড়াতে না পারার কারণে। এর আগে বিএনপি ২০০১ সালের নির্বাচনে বান্দরবান সংসদীয় আসনে ম্যাম্যা চিংকে প্রার্থিতা দেয়। তিনি সে সময় আওয়ামী লীগ প্রার্থী বীর বাহাদুর উশৈসিং-এর কাছে ৮৫৩ ভোটের ব্যবধানে অল্পের জন্য পরাজিত হন।

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের মনোনয়ন লাভ মূলত নির্ভর করে দলীয় অনুগ্রহের ওপর। এরপর জেনারেল এরশাদের আমলে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা

[২৬] প্রাগুক্ত

আসনে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে মিতালী তঞ্চঙ্গ্যাকে নিয়োগ দেয়া হয়। নব্বইয়ের গণআন্দোলনের পর ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে বিএনপি আমলে (১৯৯০-১৯৯৬) বান্দরবান থেকে তৎকালীন বিএনপি নেতা ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক কর্মী ম্যাম্যা চিংকে সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর ১৯৯৬-২০০১ সালের আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কোনো পাহাড়ি আদিবাসী নারীকে নিয়োগ না দিয়ে কক্সবাজার থেকে এথিন রাখাইনকে সংরক্ষিত নারী আসনে সংসদ সদস্য হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করে। অনুরূপভাবে বর্তমান নবম জাতীয় সংসদে ২০০৯-এর মার্চে বর্তমান সরকার আবারও এথিন রাখাইনকে মনোনয়ন দিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনেও আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের প্রতিনিধিত্ব করার কোনো সুযোগ হয়নি।

এর পেছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনটি পাহাড়ি নারীদের জন্য সংরক্ষিত না রাখা। ২০০২ সালে পত্রিকান্তরে জানা গেছে যে, বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার দেশের মোট ৬৪ জেলার মধ্যে ৬১টি জেলার জন্য প্রতিটি জেলায় ১টি করে জাতীয় সংসদের মহিলা আসন এবং বাকি ৩টি পার্বত্য জেলার জন্য মাত্র ১টি আসন সংরক্ষণের বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে। এই বৈষম্যমূলক উদ্যোগের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনসহ পার্বত্য জেলাসমূহের নারীরা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির উদ্যোগে তিন পার্বত্য জেলায় প্রতিটি জেলার জন্য ১টি করে আসন সংরক্ষণের দাবি জানিয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২ প্রধানমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান এবং ২৪ মার্চ ২০০২ ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির এই দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, সম্মিলিত নারীসমাজ, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, নিজেরা করি, কর্মজীবী নারী প্রভৃতি সংগঠন। পার্বত্য চট্টগামের আদিবাসী পাহাড়ি নারীসমাজের সেই দাবি এখনো পূরণ হয়নি। যেজন্য জাতীয় সংসদের মতো সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থায় আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের পদচারণা এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থায় আদিবাসী পাহাড়ি নারী

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যপদে নারীদের জন্য তিনটি আসন সংরক্ষণের বিধান করা হয়। তদনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮-এ উক্ত ধারা যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে প্রণীত আইনে তিনটির মধ্যে দুইটি আসন আদিবাসী পাহাড়ি নারী এবং একটি আসন স্থায়ী বাঙালি অধিবাসীর জন্য সংরক্ষণের বিধান করা হয়। পাহাড়ি নারী সদস্যদের ক্ষেত্রে একজন চাকমা জাতিগোষ্ঠী থেকে এবং আরেক জন অন্যান্য আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী থেকে নির্বাচিত হওয়ার বিধানও আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকারী আঞ্চলিক রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রস্তাবনায় সরকার কর্তৃক ১৯৯৯ সালের মে মাসে অন্তর্বর্তীকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান-সদস্যদের মনোনয়ন দিয়ে গেজেট আকারে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। আইন অনুসারে চেয়ারম্যানসহ ২২ সদস্য এবং এছাড়া তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণকে পদাধিকার বলে সদস্য হিসেবে অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। উক্ত অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও আঞ্চলিক পরিষদ আইন অনুসারে দুইজন আদিবাসী নারী সদস্য ও একজন স্থায়ী বাঙালি নারী সদস্য মনোনীত হন। আদিবাসী পাহাড়ি দুই নারী সদস্যের মধ্যে একজন চাকমা জাতিগোষ্ঠী (মাধবীলতা চাকমা) এবং অন্যজন মারমা জাতিগোষ্ঠী (উনুপ্রু চৌধুরী) থেকে মনোনীত হন।

সংরক্ষিত নারী সদস্যপদে নারীদের নিয়োগ দেয়া হলেও নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ব্যতীত আঞ্চলিক পরিষদের সাধারণ আসনে কোনো আদিবাসী পাহাড়ি নারী সদস্য মনোনীত বা নিয়োগ করা হয়নি। নারী অধিকার কর্মীদের মতে, এটা নারীসমাজের প্রতি একপ্রকার বৈষম্য ও অবহেলারই শামিল।

আইনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট অর্পিত হয়েছে। এছাড়া পরিষদের কার্য সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। উক্ত বিধান মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদে বিষয়ভিত্তিক মোট আটটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলোর মধ্যে সমাজকল্যাণ ও সমবায় বিষয়ক কমিটিতে পরিষদের আদিবাসী নারী সদস্য মিসেস উনুপ্রু চৌধুরীকে আহ্বায়ক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। এছাড়া শিক্ষা, সংস্কৃতি ও উপজাতীয় বিষয়ক কমিটির সদস্য হিসেবে পরিষদের আদিবাসী নারী সদস্য মাধবীলতা চাকমাকে নির্বাচিত করা হয়।

আঞ্চলিক পরিষদের নারী সদস্যরা অন্যান্য পুরুষ সদস্যের মতো স্ব স্ব আওতাধীন ক্ষেত্রে প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ভূমিকা পালন করেছেন বলে পাহাড়ি নারী সদস্যরা জানিয়েছেন। তবে সার্বিকভাবে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো আঞ্চলিক পরিষদেও সংরক্ষিত নারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ভূমিকার অনুপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে সামাজিক বৈষম্য ও বঞ্চনার পাশাপাশি অনেকে নারী সদস্যদের অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্বের দুর্বলতাকে দায়ী করেছেন।

অপরদিকে আঞ্চলিক পরিষদে বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে আদিবাসী পাহাড়ি নারীর অংশগ্রহণ আশাব্যঞ্জক নয়। আঞ্চলিক পরিষদে কর্মরত ৩ জন কর্মকর্তার মধ্যে ১ জন পাহাড়ি নারী এবং ৪৭ জন কর্মচারীর মধ্যে ৯ জন নারী রয়েছেন। তন্মধ্যে ১ জন বাঙালি নারী ব্যতীত সকলেই পাহাড়ি।

বলাবাহুল্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় আঞ্চলিক পরিষদেরও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারছে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও আঞ্চলিক পরিষদের আইনে বিধান রয়েছে যে, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান-সদস্যদের ভোটে আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে আরো রয়েছে যে, অন্তর্বর্তী আঞ্চলিক পরিষদ নির্বাচিত আঞ্চলিক

পরিষদের হাতে দায়িত্ব হস্তান্তর করবে (চুক্তির 'গ' খণ্ডের ১২ ধারা)। ১৯৯৯ সালে অন্তর্বর্তী আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের পর এখনো ওই পরিষদ কার্যকর রয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় আঞ্চলিক পরিষদে আদিবাসী পাহাড়ি নারীর নতুন নেতৃত্ব আসতে পারছে না বলে নারী অধিকার কর্মীরা জানান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণীত হলেও আইনানুসারে এ পরিষদকে পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। ফলে আঞ্চলিক পরিষদ তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব, যেমন পার্বত্য জেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি; পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ; সাধারণ প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা ও উন্নয়ন; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমসহ এনজিও কার্যাবালি; আদিবাসী (উপজাতীয়) আইন ও সামাজিক বিচার; পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যাবলির সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করতে পারছে না। আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও এর পরামর্শক্রমে সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার বিধান থাকলেও সরকার তা অবজ্ঞা করে চলেছে। সরকার এখনো পরিষদের কার্যবিধিমালা ঝুলিয়ে রেখেছে।

আইন অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু একের পর এক সরকারের অসদিচ্ছার কারণে ও ক্ষমতাসীন দলের দলীয়করণ নীতির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা এখনো কার্যকর হতে পারেনি। এ অঞ্চলের গণতান্ত্রিক স্বশাসন, সর্বোপরি অনগ্রসর ও অবহেলিত পাহাড়ি জনগণের স্বীয় ভাষা-সংস্কৃতি তথা ন্যায্য অধিকারসহ জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও বিকাশের ভিত্তি সুদৃঢ় হতে পারেনি। এমতাবস্থায় আদিবাসী পাহাড়ি নারীসমাজের সার্বিক উন্নয়ন এবং সকল ক্ষেত্রে তাদের অংশীদারিত্ব ব্যাহত হচ্ছে।

তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক প্রণীত রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধিত) আইন, ১৯৯৮ (যথাক্রমে ১৯৯৮ সালে ৯, ১০ ও ১১ নম্বর আইন) এর ৪ নম্বর ধারার (ঘ) উপধারায় সংযোজিত হয় যে,

(ঘ) তিনজন মহিলা সদস্য, যাহাদের দুইজন উপজাতীয় এবং একজন অ-উপজাতীয় মহিলা হইবেন।

ব্যাখ্যা— দফা (ঘ)-তে উল্লিখিত উপজাতীয় মহিলা সদস্যগণের ক্ষেত্রে জেলার বিভিন্ন উপজাতির জন্য কোটা থাকিবে না।[২৭]

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক প্রণীত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে নারীদের জন্য সদস্যপদ সংরক্ষণের বিধান যথাযথভাবে সন্নিবেশ করা হলেও তা এখনো কার্যকর হয়নি। এর পেছনে অন্যতম কারণ হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া।

উল্লেখ্য, ১৯৮৯ সালে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর নির্বাচিত পরিষদের মেয়াদ তিন বছর উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও আজ অবধি পরিষদের আর কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত

[২৭] ১৯৯৮ সনের ৯ নম্বর আইন দ্বারা এই নতুন দফা সংযোজিত হয়।

হয়নি। নির্বাচিত পার্বত্য জেলা পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর চেয়ারম্যানসহ ৫ সদস্যবিশিষ্ট অন্তর্বর্তী পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন করা হয়। একের পর এক সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর স্ব স্ব দলীয় লোকদের নিয়োগ দিয়ে এই অন্তর্বর্তী পরিষদ পরিচালিত হচ্ছে। ৫ সদস্যবিশিষ্ট উক্ত অন্তর্বর্তী পার্বত্য জেলা পরিষদে নারীদের জন্য কোনো সদস্যপদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়নি।[২৮] ফলে পাহাড়ি-বাঙালি উভয় জাতিগোষ্ঠীর নারীরা উক্ত অন্তর্বর্তী তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে তাদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে।

এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় সরকারের আমলে (২০০১-২০০৭) অন্ত র্বর্তী বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে ম্যামা চিং মারমা নামে বিএনপির একজন আদিবাসী পাহাড়ি নারীনেত্রীকে নিয়োগ দেয়া। অতি সম্প্রতি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার অন্তর্বর্তী রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য পদে একজন বাঙালি নারীকে নিয়োগ দিয়েছে। এছাড়া ১৯৯২ সালের জুন মাসে নির্বাচিত জেলা পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আর কোনো পাহাড়ি বা বাঙালি নারী পার্বত্য জেলা পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ লাভ করেনি।

তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে আদিবাসী পাহাড়ি নারীর অংশগ্রহণ আশাব্যঞ্জক নয়। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদে স্থায়ী কর্মচারী আছে ৪৪ জন, যার মধ্যে ৬ জন নারী কর্মচারী। ২ জন নারী ৩য় শ্রেণির এবং ৪ জন ৪র্থ শ্রেণির। মাস্টাররোলের কর্মচারী ২৬ জন। এদের মধ্যে কোনো নারী কর্মচারী নেই। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের শিক্ষক নিয়োগে নারীর প্রতিনিধিত্ব বেশ আশাব্যঞ্জক। চুক্তির পর ১৯৯৯-২০০৮ সালের মধ্যে মোট ১০৮ জন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে, যাঁদের মধ্যে ৩৫ জন নারী। সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে ৮৮৮ জন, যাঁদের মধ্যে ৪৫৮ জন নারী। বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে কোনো আদিবাসী পাহাড়ি নারী কর্মকর্তা নেই এবং ৩৩ জন কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ৩ জন পাহাড়ি নারী।

১৯৯৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আইন সংশোধন করে শক্তিশালী করা হয়েছে। কিন্তু পার্বত্য জেলা পরিষদের আইন যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়নি। আইন অনুযায়ী সরকার পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে গড়িমসি করে চলেছে। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আইন অনুসারে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে তিন পার্বত্য জেলার ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে নতুন ১২টি বিষয় হস্তান্তরসহ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে মোট ৩৩টি বিষয় (যাতে ৬৮টি কর্ম বিদ্যমান) হস্তান্তরের বিধান করা হয়েছে। এর মধ্যে জেলার আইনশৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ও এর উন্নতি সাধন, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় পুলিশ, মাধ্যমিক শিক্ষা, যুব কল্যাণ, পরিবেশ, জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য

[২৮] The ILO Convention on Indigenous and Tribal Populations, 1957 and the Laws of Bangladesh: A Comparative Review, Raja Devasish Roy, PRO 169, International Labour Standards Department, ILO Geneva and ILO Office, Dhaka, 2009

পরিসংখ্যান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর গুরুত্বপূর্ণ এসব বিষয়ের কোনোটিই হস্তান্তর করা হয়নি।

সরকার একের পর এক স্ব স্ব দলীয় লোকদের নিয়োগ দিয়ে ৫ সদস্যসম্বলিত অন্তর্বর্তী তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ পরিচালনা করছে। এর ফলে তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদই বর্তমানে অনেকটা অথর্ব প্রতিষ্ঠান ও দলীয়করণের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায় জেলা স্তরে প্রতিনিধিত্বশীল শক্তিশালী বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রর্বতন, এই অঞ্চলের গণমানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ, অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জেলার গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে তিন পার্বত্য জেলার গণমুখী উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ ইত্যাদি ব্যাহত হচ্ছে। ফলে তিন পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রান্তিক ও অনগ্রসর অংশ হিসেবে পাহাড়ি নারীসমাজ এর প্রত্যক্ষ ক্ষতির শিকার হচ্ছে বলে আদিবাসী পাহাড়ি নারী অধিকার সংগঠকরা মনে করেন।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় আদিবাসী পাহাড়ি নারী

ইউনিয়ন পরিষদ

১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যপদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের জন্য আইন পাস হয়। এতে স্থানীয় প্রশাসনে নজিরবিহীনভাবে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ইউনিয়ন পরিষদে সাধারণ আসনসহ সংরক্ষিত আসনেও নারীদের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। তিন পার্বত্য জেলায় ১১১টি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে। এসব ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত নারী সদস্যপদে অনেক আদিবাসী পাহাড়ি নারী নির্বাচিত হন। এমনকি খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার বর্মাছড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও একজন আদিবাসী পাহাড়ি নারী (দেবরাণী চাকমা) নির্বাচিত হন।

সাধারণভাবে ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত নারী আসনে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠী থেকে নির্বাচনের তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু চাক, বম, খিয়াং, পাংখো, খুমী, ম্রো, লুসাই প্রভৃতি অতি স্বল্প জনসংখ্যাসম্পন্ন এবং তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর আদিবাসী পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীর কোনো নারী সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন বলে তথ্য পাওয়া যায়নি।

তবে অনেকে উল্লেখ করেন যে, ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য সাধারণভাবে আসন সংরক্ষণ করা হলেও আদিবাসী নারীদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়ি নারীরা ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থায় অনেকটা প্রতিনিধিত্বের সুযোগ লাভ করলেও সমতল অঞ্চলের আদিবাসী নারীরা সেই সুযোগ থেকে কার্যত অধিকাংশ ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়। সমতল অঞ্চলে বাঙালি জনগোষ্ঠীর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় কেবল আদিবাসী নারী নয়, সাধারণভাবে আদিবাসী নারী-পুরুষ উভয়ের বেলায়ই প্রয়োজনীয় হারে ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাচ্ছেন না। এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রাম যে সকল ইউনিয়নে বসতি স্থাপনকারী বাঙালির আধিক্য রয়েছে সেসব ইউনিয়নেও আদিবাসী নারীসহ পাহাড়িরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বার পদে নির্বাচিত হতে পারেন না। এজন্য পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সমতল অঞ্চলের মধ্যে যে সমস্ত অঞ্চল আদিবাসী অধ্যুষিত সে

সকল ইউনিয়ন পরিষদে আদিবাসী নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য আসন সংরক্ষণের দাবি জানিয়ে আসছে আদিবাসী সংগঠনগুলো।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে ইউনিয়ন পরিষদে পাহাড়ি নারীর জন্য আসন সংরক্ষণের বিষয়ে সরাসরি কোনো কিছুর উল্লেখ নেই। তবে পার্বত্য চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে এবং এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধান করা হয়েছে ('ক' খণ্ডের ১ নম্বর ধারা)। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির এই ধারা বলে পার্বত্যাঞ্চলের পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চলের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে ইউনিয়ন পরিষদে পাহাড়ি প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ইউনিয়ন পরিষদসহ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সকল স্তরে আদিবাসী নারীসহ আদিবাসী পাহাড়িদের জন্য চেয়ারম্যান-মেম্বার পদ সংরক্ষণের বিধান ইউনিয়ন পরিষদ আইনে অন্তর্ভুক্ত করা আশু জরুরি বলে পাহাড়ি নারী নেতৃবৃন্দের অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে "পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান" জেলা পর্যায়ে বর্তমানে সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন বিষয় [চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩৪(ছ) ধারা এবং ১৯৯৮ সালের পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের প্রথম তফসিলের ২৯ নম্বর পরিষদ কার্যাবলি]। অধিকন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে অঞ্চল পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ "পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়" করে [চুক্তির 'গ' খণ্ডের ৯(খ) ধারা ও ১৯৯৮ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ২২(খ) ধারা]।

কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর প্রণীত স্থানীয় সরকার (সংশোধনী) অধ্যাদেশ ২০০১-এ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনের বিশেষ বিধানাবলি ও আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র প্রেক্ষাপট সন্নিবেশ করা হয়নি। ফলে ইউনিয়ন পরিষদের ওপর সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ এবং আঞ্চলিক পরিষদের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করার কার্যাবলি ব্যাহত হচ্ছে। স্থানীয় সরকার আইনে পার্বত্য চট্টগ্রামের এই বিশেষ প্রেক্ষাপট ও বিধানাবলি সন্নিবেশিত না হওয়ায় আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের জন্য ইউনিয়ন পরিষদেও স্বতন্ত্রভাবে সদস্যপদ/আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় যে সকল ইউনিয়নে সরকারি উদ্যোগে সমতল অঞ্চল থেকে বাঙালিদের এনে বসতি প্রদান করা হয়, সে সকল ইউনিয়নে সাধারণ আদিবাসী প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়া সম্ভব নয়। এসব এলাকায় আদিবাসী পাহাড়ি নারী-পুরুষের বেলায় প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ সীমিত বলা যায়।

একটা বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যপদে সংরক্ষিত আসনে আদিবাসী পাহাড়ি নারীরা নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পেলেও সার্বিক কর্মকাণ্ডে নারী সদস্যদের পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণ করা থেকে নানা কায়দায় দূরে সরিয়ে রাখা হয় বলে অভিযোগ করা হয়। এমতাবস্থায় নির্বাচিত নারী সদস্যরা দায়িত্ব, ক্ষমতা এবং আইনগত অধিকার নির্ধারণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন। এর ফলে ২০০১-এর এপ্রিল মাসে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ-এর একটি সংশোধনী প্রস্তাব সংসদে পাস করা হয়। এতে ইউনিয়ন পরিষদের স্টান্ডিং

কমিটির সদস্য সংখ্যা ৭ থেকে বাড়িয়ে ১২ করা হয়। অপরদিকে কমপক্ষে কমিটির একটিতে একজন নারী সদস্যকে চেয়ারম্যান হিসেবে রাখার বিধান করা হয়। পরবর্তী সময়ে প্রতিটি ওয়ার্ডে একজন নারী সদস্যকে চেয়ারম্যান করে একটি সমাজকল্যাণ কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইউনিয়ন পরিষদে নারীর সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ভূমিকা উপেক্ষিত থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে।

উপজেলা পরিষদ

উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা হয় জেনারেল এরশাদের আমলে ১৯৮২ সালে। গণআন্দোলনের ফলে এরশাদ সরকারের পতন হওয়ার পর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় এসে উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থা বাতিল করে। ২০০৭ সালের ১/১১ এর পর ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আবার উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়। তারই অংশ হিসেবে গত ২২ জানুয়ারি ২০০৯ উপজেলা পরিষদের তৃতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা পরিষদের নতুন ব্যবস্থায় একজন চেয়ারম্যান এবং দুইজন ভাইস চেয়ারম্যানের বিধান করা হয়। চেয়ারম্যানের পদ নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত রাখা হয় এবং ভাইস চেয়ারম্যানের দু'টি পদের মধ্যে একটি পুরুষের জন্য ও আরেকটি নারীর জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়।

২০০৯-এর এপ্রিল মাসে বর্তমান সরকার জাতীয় সংসদে উপজেলা পরিষদ আইন পাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর উক্ত উপজেলা পরিষদ আইন প্রণীত হলেও উক্ত আইনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং আদিবাসী পাহাড়িদের স্বতন্ত্র প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা হয়নি। তাই সাধারণভাবে উপজেলা পরিষদে ভাইস চেয়ারম্যানের একটি পদ নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হলেও আদিবাসী অধ্যুষিত উপজেলার ক্ষেত্রে আদিবাসী নারীদের বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়নি। যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চলের স্বীকৃতি ও এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধান করা হয়েছে, সেহেতু আদিবাসী নারীসহ পাহাড়িদের জন্য উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান-ভাইস চেয়ারম্যান পদ সংরক্ষণ করা অত্যাবশ্যক বলে পাহাড়িদের অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেন।

গত তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে কোনো আদিবাসী পাহাড়ি নারী চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হতে পারেননি। তবে তিন পার্বত্য জেলায় ২৫টি উপজেলা পরিষদের মধ্যে ১৫ জন আদিবাসী পাহাড়ি নারী ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন। তন্মধ্যে ১০ জন চাকমা, ২ জন মারমা, ২ জন ত্রিপুরা ও ১ জন তঞ্চঙ্গ্যা আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর নারী রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর এটা নিঃসন্দেহে আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি বলা যেতে পারে। তবে ইউনিয়ন পরিষদের মতো উপজেলা পরিষদেও নারী ভাইস চেয়ারম্যানদের সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ক্ষেত্রে অবহেলার শিকার হতে হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

পৌরসভা

তিন পার্বত্য জেলায় মোট ৭টি পৌরসভা রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পৌরসভায় নারীর প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে সরাসরি কোনো কিছুর উল্লেখ নেই। তবে চুক্তিতে উল্লেখ আছে যে, "পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান" বিষয়টি তিন

পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত হবে [চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩৪(ছ) ধারা এবং ১৯৯৮ সালের পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের প্রথম তফসিলের ২৯ নম্বর পরিষদ কার্যাবলি]। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, অঞ্চল পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ "পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করবে" [চুক্তির 'গ' খণ্ডের ৯(খ) ধারা ও ১৯৯৮ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ২২(খ) ধারা]। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির এসব ধারা বলে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ পৌরসভার নারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী দায়িত্ব অর্পণে পরোক্ষভাবে হলেও ভূমিকা পালন করতে পারে।

বলাবাহুল্য যে, পৌরসভা আইনেও পৌর কমিশনার পদে সাধারণভাবে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন রয়েছে। তবে ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের মতো পৌরসভায়ও আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের বেলায় কোনো আসন সংরক্ষিত নেই। যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান ও এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধান করা হয়েছে, সেহেতু আদিবাসী নারীসহ পাহাড়িদের জন্য পৌরসভার চেয়ারম্যান-কমিশনার পদ সংরক্ষণ করা অত্যাবশ্যক বলে পাহাড়িদের অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেন।

তবে সাধারণভাবে পৌরসভা এলাকাগুলোতে বাঙালির সংখ্যাধিক্য থাকায় আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের পক্ষে সংরক্ষিত পৌর কমিশনার পদে নির্বাচিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে স্বীকৃত পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চলের মর্যাদা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপের অভাবের কারণে পৌর এলাকায় বহিরাগত বাঙালিদের বসতিস্থাপন অব্যাহতভাবে বেড়ে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর পৌর এলাকায় আদিবাসী পাহাড়িরা আরো অধিকতরভাবে সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছে। ফলে নারীদের জন্য সংরক্ষিত পৌর কমিশনার পদে আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের নির্বাচিত হওয়া আরো কঠিন হয়ে পড়ছে।

এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পৌরসভা আইনে সাধারণভাবে নারীদের জন্য সংরক্ষিত কমিশনার পদে কতিপয় ক্ষেত্রে আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের মধ্যে থেকে অনেকে নির্বাচিত হয়ে আসছেন। পৌরসভার কমিশনার পদে নির্বাচিত হওয়া শহরাঞ্চলের আদিবাসী পাহাড়ি মধ্যবিত্ত নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেন। অন্যান্য স্থানীয় সরকার পরিষদের মতো এক্ষেত্রেও অভিযোগ রয়েছে যে, নারী কমিশনাররা নানা অবহেলা ও বৈষম্যের শিকার হন। তাদেরকে সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে।

পৌরসভার সংরক্ষিত নারী কমিশনার পদে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠী থেকে নির্বাচিত হলেও এ যাবৎ চাক, বম, খিয়াং, পাংখো, খুমী, ম্রো, লুসাই ইত্যাদি স্বল্প জনসংখ্যাসম্পন্ন আদিবাসী পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীর কোনো নারী সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন বলে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে, তুলনামূলভাবে পৌর এলাকায় এসব অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠীর লোকজনের বসবাস সাধারণত কম। প্রধানত তাদের বসতি দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে আদিবাসী পাহাড়ি নারী

পার্বত্য চট্টগ্রামে বলবৎ রয়েছে রাজা-হেডম্যান-কার্বারী নিয়ে গঠিত আদিবাসী পাহাড়িদের প্রথাগত প্রতিষ্ঠান। পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটি প্রথাগত সার্কেল রয়েছে, যার প্রধানকে 'রাজা' বা 'সার্কেল চিফ' বলা হয়। সার্কেল তিনটি হলো— চাকমা সার্কেল, বোমাং সার্কেল ও মং সার্কেল। এসব সার্কেল কয়েকটি মৌজায় ভাগ করা হয়। মৌজাপ্রধানকে বলা হয় 'হেডম্যান'। আর একটি মৌজাকে কয়েকটি গ্রামে ভাগ করা হয়। গ্রামপ্রধানকে বলা হয় 'কার্বারী'। চাকমা সার্কেলের (রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলাধীন) ১৭৭টি মৌজা, বোমাং সার্কেলের (বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি জেলাধীন) ১০৯টি মৌজা এবং মং সার্কেলের (খাগড়াছড়ি জেলাধীন) ৮৩টি মৌজা রয়েছে। তিন সার্কেলের প্রায় সাড়ে তিন হাজারের অধিক গ্রাম রয়েছে, যার অর্থ হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে সাড়ে তিন হাজারের অধিক গ্রামকার্বারী রয়েছেন।

রাজা-হেডম্যান-কার্বারী সম্বলিত এই প্রথাগত প্রতিষ্ঠান আদিবাসী পাহাড়িদের ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, রাজস্ব আদায়, সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা, সমাজের বিরোধ নিষ্পত্তি তথা বিচার-আচার করা, জনকল্যাণমূলক কাজের উদ্যোগ নেয়া ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে সার্কেল চিফের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। সার্কেল চিফ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে উন্নয়ন ও অন্যান্য বিষয় পরামর্শ প্রদান করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে সার্কেল চিফ স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান করে থাকেন। হেডম্যান ভূমি রাজস্ব ও জুম খাজনা সংগ্রহ; ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা; মৌজার স্থায়ী বাসিন্দার সার্টিফিকেট প্রদান; সামাজিক বিচার-আচারের দায়িত্ব পালন করেন। কার্বারী গ্রামের সকল ধরনের মামলা (ফৌজদারি ও দেওয়ানি) নিষ্পত্তি ও গ্রামের শান্তিশৃঙ্খলা বিধান করে থাকেন।

আদিবাসী পাহাড়িদের এসব প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে পাহাড়ি নারীদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত অল্প ও সীমিত। রাজা বা সার্কেল চিফ পদটি বংশপরম্পরাবাহিত একটি পদ, যা উত্তরাধিকারী ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। চাকমা সার্কেলের ক্ষেত্রে রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রসন্তানই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। তাই কোনো ব্যতিক্রম না ঘটলে সাধারণভাবে চাকমা রাজবংশের কোনো কন্যাসন্তানের পক্ষে রাজা হওয়া সম্ভব নয়। ব্রিটিশ শাসনের প্রাক্কালের কালিন্দী রাণী ব্যতীত অন্য কোনো নারী চাকমা রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেননি।

মং সার্কেলের ক্ষেত্রে রাজার ঔরসজাত সন্তান না থাকলে রাজার স্ত্রী বা রাজার পৈত্রিক সূত্রের রক্ত সম্পর্কীয় যোগ্য ব্যক্তি প্রচলিত রীতি ও সমাজস্বীকৃত প্রথা অনুযায়ী মং সার্কেলের সার্কেল চিফ পদে অধিষ্ঠিত হন। উত্তরাধিকারের এই বিধান অনুসারে কিছু সময়ের জন্য মং সার্কেলের রাজা হিসেবে যথাক্রমে নানু মা এবং নীহার বালা নামে দুইজন নারী অভিষিক্ত হন।

বোমাং সার্কেলে রাজ পরিবারের মাতৃ-পিতৃকুল থেকে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনিই বোমাংরাজ পদের বৈধ উত্তরাধিকারী। সাধারণত পুরুষ বয়োজ্যেষ্ঠরাই এই উত্তরাধিকারী লাভ করে। এ যাবৎ বোমাং সার্কেলের রাজপদে রাজ পরিবারের কোনো নারী অভিষিক্ত হননি।

অপরদিকে তিন সার্কেলে মোট ৩৬৯ জন হেডম্যান রয়েছেন। এক কালে হেডম্যানরা চিফ অথবা গ্রামবাসী কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। ব্রিটিশ শাসনের প্রথমদিকে হেডম্যানরা চিফদের দ্বারা নিযুক্ত হতেন। বর্তমানে সার্কেল চিফের পরামর্শক্রমে ডেপুটি কমিশনাররা হেডম্যান নিযুক্ত করে থাকেন। এ ধরনের নিয়োগ বংশানুক্রমিক নয়, তবে নিযুক্তির ক্ষেত্রে হেডম্যানের পুত্র অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন। হেডম্যান পদের ক্ষেত্রেও আদিবাসী পাহাড়ি নারীরা অবহেলিত ও উপেক্ষিত। ৩৬৯ জন হেডম্যানের মধ্যে নারী হেডম্যান হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র। এ বিষয়ে অবশ্য নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে যে, চাকমা সার্কেলে ৫ জন, বোমাং সার্কেলে ২ জন ও মং সার্কেলে ২ জন আদিবাসী নারী হেডম্যান রয়েছেন। তাঁরা সাধারণত ব্যতিক্রম হিসেবে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী বা পিতার মৃত্যুর পর কন্যা সন্তান হিসেবে এসব হেডম্যানপদ লাভ করেছেন।

অনুরূপভাবে গ্রামপ্রধান 'কার্বারী' পদে পাহাড়ি নারীর অংশীদারিত্ব একেবারেই হতাশাব্যঞ্জক বলা যায়। চাকমা সার্কেলে কার্বারী পদে মাত্র দুইজন নারী নিয়োগলাভ করেছেন বলে তথ্য পাওয়া গেছে। মং সার্কেলেও দুইজন নারী কার্বারী আছেন বলে জানা গেছে। বোমাং সার্কেলের এ জাতীয় কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

আদিবাসী পাহাড়িদের প্রথাগত প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানে স্বল্প জনসংখ্যাসম্পন্ন ও অধিকতর অনগ্রসর আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর পুরুষ সদস্যের অংশগ্রহণ দেখা গেলেও নারীর অংশগ্রহণ একেবারেই শূন্য। হেডম্যান বা কার্বারী কোনো পদেই চাক, বম, খিয়াং, পাংখো, খুমী, ম্রো, লুসাই ইত্যাদি স্বল্প জনসংখ্যাসম্পন্ন আদিবাসী পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীর কোনো নারী সদস্য নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে রাজা-হেডম্যান-কার্বারী সম্বলিত প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে আদিবাসী পাহাড়ি নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ে সরাসরি কোনো কিছুর উল্লেখ নেই।

সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে এবং এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধান করা হয়েছে ('ক' খণ্ডের ১ নম্বর ধারা)। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির উল্লিখিত ধারা বলে আদিবাসী পাহাড়িদের প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে আদিবাসী নারীদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব ও দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে পাহাড়ি নারী নেতৃবৃন্দের অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেন। তবে এখনো এসব পরিষদের পক্ষ থেকে সেভাবে উদ্যোগে গ্রহণের যথাযথ প্রয়াস লক্ষ করা যায়নি।

আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে যেভাবে পাহাড়ি নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে, সেটাকে নৈতিক ভিত্তি ও উৎস হিসেবে বিবেচনা করে প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে পাহাড়ি নারীদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে বলে অনেক নারীনেত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। তবে এখনো এই দাবি বা আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপায়ণে কার্যকর কোনো প্রয়াস দেখা যায়নি। সামাজিক বিচার ব্যবস্থায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয় বলে তথ্য পাওয়া গেলেও সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ভূমিকায় তাঁরা প্রায়ই উপেক্ষিত হন বলে নারীনেত্রীদের অভিযোগ রয়েছে।

প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের প্রান্তিক অবস্থান সত্ত্বেও, সমতল অঞ্চলের সালিশ বোর্ডের তুলনায় এই কাঠামো পাহাড়ি নারীদের প্রতি অনেক বেশি সংবেদন ও সহানুভূতিশীল বলে অনেকে জানিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, সমতল এলাকার গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় সালিশে নারীদের কথা বলার কোনো সুযোগ নেই এবং অধিকাংশ গ্রাম্য সালিশের রায়গুলো তাদের বিরুদ্ধে চলে যায়। পক্ষান্তরে পার্বত্য চট্টগ্রামের হেডম্যান ও সার্কেল চিফের ঐতিহ্যগত আদালতে দেখা যায়, বিচারকরা বা বিচার কমিটিগুলো আদিবাসী পাহাড়ি নারী অধিকারের পক্ষে শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করে। এটা সমতলের সালিশে কখনোই দেখা যায় না। বিবাহ বিচ্ছেদ ও শিশু অভিভাবকত্ব সংক্রান্ত চাকমা সার্কেল চিফের কিছু মামলা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, নারীদের যথাযথভাবে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে, আদিবাসী পাহাড়িদের ঐতিহ্যগত বিচার ব্যবস্থায় আদিবাসী পাহাড়ি নারীরা স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ করতে পারে, যা সমতলে সাধারণত দেখা দেখা যায় না।[২৯]

রাজনৈতিক দলগুলোতে আদিবাসী পাহাড়ি নারী

জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোতে আদিবাসী পাহাড়ি নারীর পদচারণা কিছুটা লক্ষ করা যায়। নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে কিছু নারীকর্মীকেও দেখা যায়। এক্ষেত্রে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর চেয়ে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলো অনেকটা এগিয়ে আছে। নেতৃস্থানীয় আদিবাসী পাহাড়ি নারীকর্মীর উপস্থিতি আঞ্চলিক পর্যায়ের আদিবাসী পাহাড়ি রাজনৈতিক দলে বেশি দেখা যায়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ১৯৯৯, ২০০২ ও ২০০৬ সালে তিনটি জাতীয় সম্মেলন (কংগ্রেস) অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৯ সালের সম্মেলনে নির্বাচিত ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটিতে ৫ জন নারী, ২০০৩ সালের কেন্দ্রীয় কমিটিতে ৫ জন নারী এবং ২০০৬ সালের ৯ম কেন্দ্রীয় কমিটিতে ৩ জন নারী নির্বাচিত হন। প্রথম ৫ জন নারী সদস্যের মধ্যে ৩ জন চাকমা, ১ জন মারমা ও ১ জন ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠীর ছিলেন। জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির নারী সদস্যদের মধ্য থেকে একজন মহিলা বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

আদিবাসী পাহাড়ি নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে ও রাজনীতিতে পাহাড়ি নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরেও এই দুই আদিবাসী নারী সংগঠন পাহাড়ি নারীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জোরালো সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। আদিবাসী পাহাড়ি নারীর ওপর জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক শোষণ-নিপীড়ন, বিশেষ করে নারীর ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে এরা সোচ্চার ভূমিকা পালন করে চলেছে।

[২৯] Human Rights and the Indigenous Women: A Case Study from CHT, Dr. Sadek Halim, State of Human Rights in Bangladesh: Women's Perspective, (Edited by Dr. Khaleda Salauddin, Ms. Roushan Jahan and Prof. Latifa Akanda), Women for Women, Dhaka, June 2002

এই সংগঠনের জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে শাখা সংগঠন রয়েছে। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুল পর্যায়ে শাখা সংগঠন রয়েছে।

জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগের ৬৩ সদস্যবিশিষ্ট রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির মধ্যে ২ জন পাহাড়ি নারী (১ জন চাকমা ও ১ জন মারমা) এবং ৭১ সদস্যবিশিষ্ট বান্দরবান জেলা কমিটির মধ্যে ৩ জন পাহাড়ি নারী (২ জন মারমা ও ১ জন তঞ্চঙ্গ্যা) রয়েছেন। অপরদিকে বিএনপির ৫১ সদস্যবিশিষ্ট রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির মধ্যে একজন পাহাড়ি নারী রয়েছেন। সমসংখ্যক সদস্যবিশিষ্ট বিএনপি বান্দরবান জেলা কমিটির মধ্যে কোনো পাহাড়ি নারী নেই।

জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোর বিভিন্ন স্তরের কমিটিতে আদিবাসী পাহাড়ি নারীর অংশগ্রহণ থাকলেও তাদের প্রতিনিধিত্ব অনেকটা আলংকারিক অর্থে রাখা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। দলের নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় তাদের ভূমিকা যথাযথভাবে প্রাধান্য পায় না বলে নারী নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন। তবে এক্ষেত্রে একদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য, অন্যদিকে আদিবাসী নারীদের মধ্যে যোগ্য নেতৃত্বের সংকট অন্যতম কারণ বলেও অনেকে মতপ্রকাশ করেন।

তিন পার্বত্য জেলায় জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর নারী অঙ্গ সংগঠনের কার্যক্রম সক্রিয় রয়েছে। আদিবাসী পাহাড়ি নারী বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি না থাকায়, সর্বোপরি আদিবাসী পাহাড়ি নারীর ওপর চলমান জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ক্ষেত্রে নীরব ভূমিকার কারণে আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের মধ্যে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর নারী অঙ্গসংগঠনগুলো কোনো প্রকার রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পাহাড়ি নারী

আদিবাসী সমাজে নারীর অবস্থান

সরকারি পরিসংখ্যানে আদিবাসী নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এটা সর্বজনবিদিত যে, আদিবাসী সমাজের মধ্যে আদিবাসী নারীরাই সবচেয়ে দুর্বল অংশ। আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা সবসময় পুরুষের চেয়ে কম মর্যাদা পেয়ে থাকেন। তাঁরাই সবচেয়ে বেশি মানবাধিকারের লঙ্ঘনের শিকার হন।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১০, ১৯, ২৮ ও ২৯ নম্বর অনুচ্ছেদে নারীর সমঅধিকারের কথা উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে তার কোনো মিল নেই। আইন ব্যবস্থায়, বিশেষ করে পারিবারিক বিষয় যেমন বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব, উত্তরাধিকার ইত্যাদিতে নারী-পুরুষের বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। হেডম্যান/কার্বারী কর্তৃক পরিচালিত গ্রাম্য সালিশিগুলিতে নারীর সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ভূমিকা নেই বললেই চলে। ইদানীং তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদগুলিতে নির্বাচিত আদিবাসী নারী প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠিত সালিশিগুলিতে নারীদের সম্পৃক্ত করে এ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনায় ভূমিকা রাখছেন।

১৯৯৭ সালে প্রবর্তিত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও বিচার ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন কার্যকর না হওয়ার কারণে পাহাড়ি নারীরা এখনো বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী সুদূর অতীতকাল থেকে অলিখিতভাবে সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সামাজিক রীতিনীতির ওপর ভিত্তি করে আদিবাসী সামাজিক প্রথা অনুসরণ করে আসছেন, যা আজো মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে। বিভিন্ন আদিবাসী সমাজে একই গোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। রক্তের সম্পর্ক আছে এমন আত্মীয়ের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ।

তুলনামূলকভাবে আদিবাসী পাহাড়ি নারীরা তাদের জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন। বিয়ে হয় প্রথাগত নিয়মকানুন অনুসারে এবং তা রেকর্ড করা হয় না। বিয়ের পরে কনে সাধারণত আরেক গ্রামে চলে যান। নতুন পরিবারে কনের ওপর প্রচুর কাজের ভার পড়ে এবং তাঁর পরিচিতি দাঁড়ায় কারোর স্ত্রী বা কারোর পুত্রবধূ হিসেবে। সংক্ষেপে একজন পুরুষ সারাজীবন পরিচিত হন তাঁর নিজের নামে, কিন্তু একজন নারী পরিচিত হন তাঁর পুরুষ আত্মীয়ের পরিচয়ের ভিত্তিতে। এভাবে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত আত্মীয়তার পদ্ধতি আদিবাসী নারীদের স্বতন্ত্র সামাজিক পরিচিতি স্বীকার করে না।[৩০]

[৩০] আদিবাসী নারীদের নিরাপত্তাহীনতা : পার্বত্য চট্টগাম প্রেক্ষিত, ড. সাদেকা হালিম, জুম পাহাড়ের জীবন, (মঙ্গল কুমার চাকমা, সোহরাব হাসান ও আবদুল আওয়াল সম্পাদিত), গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ঢাকা, মে ২০০৮

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়ি সমাজে বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ খুবই সীমিত বলা যায়। বহুবিবাহের ঘটনা ঘটলেও এর সংখ্যা অত্যন্ত কম। তবে বিবাহবিচ্ছেদ ও বহুবিবাহ শিক্ষিত আদিবাসীদের মধ্যে আরো কম প্রচলিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর নারী অধিকার বাস্তবায়ন ও জেন্ডার ইস্যুতে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর উদ্যোগে নানা প্রয়াস চলছে। এতে নারী অধিকার ও জেন্ডার বিষয়ে আদিবাসী পাহাড়ি সমাজে আরো বেশি সচেতনতা গড়ে উঠছে বলে আদিবাসী নারী অধিকার কর্মীরা মতপ্রকাশ করেছেন।

সম্পত্তির উত্তরাধিকারে আদিবাসী পাহাড়ি নারী

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে সম্পত্তির ওপর আদিবাসী পাহাড়ি নারীর উত্তরাধিকার বিষয়ে সরাসরি কোনো কিছু বলা নেই। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে "উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার" বিষয়টি যথাক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ [চুক্তির 'গ' খণ্ডের ৯(ঙ) ধারা] এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে [চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩৪(গ) ধারা]। এই ধারা বলে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্পত্তির ওপর আদিবাসী পাহাড়ি নারীর উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে আদিবাসী পাহাড়িদের প্রথাগত সামাজিক আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে এবং সম্পত্তির ওপর আদিবাসী পাহাড়িদের উত্তরাধিকার স্বত্ব নিশ্চিত করতে পারে। তবে এ ধরনের কোনো উদ্যোগ-আয়োজন এখনো দেখা যায়নি।

বাংলাদেশ সংবিধানে (১০, ১৯, ২৭, ২৮ এবং ২৯ নম্বর অনুচ্ছেদ) নারী-পুরুষের সমঅধিকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পরিবার ও সমাজে সমঅধিকার কাজ করে না বিশেষ করে সম্পদ ভোগের বেলায়। আদিবাসী পাহাড়ি সমাজে সাধারণভাবে একমাত্র পুত্রসন্তানরাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে, নারীরা নয়। তবে বিশেষ ব্যবস্থাপনার সুযোগ আছে। পিতা যদি কন্যাসন্তানকে জীবদ্দশায় সম্পত্তি দিয়ে যান অথবা উইল করে যান তাহলে কন্যাসন্তানেরা সম্পত্তি পেতে পারে। অবশ্য বর্তমান সময়ে চাকুরিজীবী তথা উপার্জনকারী নারীরা নিজ প্রচেষ্টায় কোনো অর্থ বা সম্পত্তি অর্জন করলে সেই অর্থে বা সম্পত্তিতে তাঁর অধিকার রয়েছে বলে মেনে নেয়া হয়।

ভূমির সাথে আদিবাসী নারীদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, কৃষিতে নারীদের অংশগ্রহণ প্রায় ৯০ শতাংশ; কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এই ভূমির ওপর আদিবাসী নারীদের অধিকাংশের মালিকানা নেই। আদিবাসী নারীদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার পেছনে এই অসম উত্তরাধিকার ব্যবস্থা অন্যতম একটি কারণ। এর ফলে পারিবারিক পরিধিতে পুরুষের ওপর নারীর নির্ভরশীলতা দৃঢ়ভাবে কায়েম হয়েছে। বৈষম্যমূলক উত্তরাধিকার আইন নারীর সার্বিক মুক্তিকে আরো বিঘ্নিত করেছে। কোনো কোনো জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে নারীরা সম্পত্তির অংশ পেলেও তা তাঁরা দখল কিংবা ভোগ করতে পারেন না।

স্বল্প জনসংখ্যাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীসহ অধিকাংশ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উত্তরাধিকার আইন নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক। আদিবাসী সমাজে কেবল পুত্রসন্তানরাই ভূ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। সাধারণত নারীরা পিতৃসম্পত্তির কোনো উত্তরাধিকার দাবি করতে পারেন না। এটার ব্যতিক্রম দেখা যায় কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলের মারমা জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে। মারমা সমাজে মায়ের সম্পত্তি মেয়ের পাওয়ার

বিধান রয়েছে। কিন্তু স্বেচ্ছায় মারমা নারীরা তা পায় না। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তা অর্জন করতে হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। তাই অনেকে পারিবারিক বিবাদ এড়ানোর জন্য সম্পত্তি দাবি করেন না।

আদিবাসী পাহাড়ি সমাজের প্রথাগত সামাজিক আইন অনুসারে সমাজসিদ্ধ নিয়মে বিবাহিত একজন স্ত্রী তাঁর স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণের খরচ পাবার অধিকারী হন। একজন পাহাড়ি নারী বিবাহের পূর্বে বা পরে স্বামীর সংসারে কিংবা পৈত্রিক অথবা মাতৃক সূত্রে কিংবা তাঁর আত্মীয় কর্তৃক দান বা উপহার হিসেবে কিংবা স্বোপার্জিত অর্থে সম্পত্তি ক্রয় অথবা লাভ করতে পারে। বিবাহের পূর্বে অর্জিত কোনো সম্পত্তির ওপর আইনত নিরঙ্কুশ মালিকানাস্বত্ব ও অধিকার স্ত্রীর থাকে। বিবাহের পর একজন নারী স্বামীর পরিবারের পদবি ও মর্যাদার অধিকারী হন।

স্বামী নিষ্ঠুর প্রকৃতির হলে, স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করলে, স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের কারণে সতীনের সাথে একসঙ্গে সংসারে অবস্থান বা বসবাসে অসম্মত হলে, সেক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রী স্বামীর ভিটায় নিরাপদ অবস্থানে অথবা স্বামীর রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়ের পৃথকান্নে থেকে স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ লাভের অধিকারী হন অথবা সামাজিক আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পিত্রালয়ে অবস্থান করে স্বামীর কাছ থেকে খোরপোষ লাভের অধীকারী হন। বিবাহের পর স্বামী বৈবাহিক সম্পর্ককে অগ্রাহ্য করলে বা অব্যাহত না রাখলে অথবা ভরণপোষণ প্রদানে বিরত থাকলে স্ত্রী তাঁর দাম্পত্য সম্পর্ক ও দাবি পুনরুদ্ধারের জন্য সমাজপতি বা কার্বারী-হেডম্যান আদালতে মামলা করার অধিকার রাখেন। স্বামীর দ্বিতীয় বা একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে স্ত্রী আপত্তি করার অধিকার রাখেন। পক্ষান্তরে স্বামী যদি পুরুষত্বহীন বা নপুংশক হন অথবা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন কিংবা মানসিক ভারসাম্যহীন হন, সেক্ষেত্রে স্ত্রী সমাজপতি বা কার্বারী-হেডম্যান আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পাদনের অধিকারী হন।[৩১]

রাঙ্গামাটি জেলা আদালতের অ্যাডভোকেট প্রতীম রায় পাম্পুর মতে, সার্কেলভেদে আদিবাসী সমাজে বৈষম্যমূলক উত্তরাধিকার প্রথার প্রচলন রয়েছে। যেমন চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, খুমী জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কেবল পুত্রসন্তানরা আইনগত উত্তরাধিকার লাভ করে এবং পুত্রসন্তানের অবর্তমানে কন্যাসন্তানরা পৈত্রিক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করেন। লুসাই ও পাংখো জাতিগোষ্ঠীতে পুত্রসন্তানের অবর্তমানে স্ত্রী ও কন্যাসন্তানরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করেন না। সেক্ষেত্রে পিতৃকুলের পুরুষ সদস্যরা মালিকানা লাভ করে থাকেন। আবার বোমাং সার্কেলের মারমা জাতিগোষ্ঠীর কন্যাসন্তানরা পৈত্রিক সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ লাভ করলেও চাকমা ও মং সার্কেলের মারমা জাতিগোষ্ঠীর কন্যাসন্তানরা কোনো উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করেন না। অন্যদিকে বান্দরবান জেলার ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠীর রিয়াং ও উসুই গোত্রের সদস্যদের মধ্যে মৃতের সম্পত্তিতে স্ত্রী এবং পুত্র ও কন্যাসন্তানদের সমান অংশ লাভের বিধান রয়েছে। পক্ষান্তরে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠীর বেলায় কোনো কোনো গোত্রের নারীরা সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করেন না।

---

[৩১] চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, পাংখো, লুসাই, খিয়াং, ম্রো, বম, খুমী ও চাক জাতিগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন, চাকমা, এডভোকেট জ্ঞানেন্দু বিকাশ; রায়, এডভোকেট প্রতিম; দে, শৈলেন (সম্পা.), কপো সেবা সংঘ, আদালত সড়ক, বনরূপা, রাঙ্গামাটি, সেপ্টেম্বর ২০০৭।

প্রতীম রায় পাম্পু আরো বলেন, চাক জাতিগোষ্ঠীতে পুত্রসন্তানের সাথে স্ত্রীও সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করলেও কন্যাসন্তানরা কোনো সম্পত্তি লাভ করেন না। আবার খিয়াং জাতিগোষ্ঠীর বেলায় সম্পত্তিতে স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাসন্তানরা সমানহারে মালিকানা লাভ করে থাকেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী সমাজের উপরোল্লিখিত বৈষম্যমূলক উত্তরাধিকার প্রথা পর্যালোচনা করলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মাণ হয় যে, বৈষম্যমূলক উত্তরাধিকার প্রথা আদিবাসী পাহাড়ি নারীর সার্বিক মুক্তিকে বিঘ্নিত করছে; জানান অ্যাডভোকেট প্রতীম রায় পাম্পু।

উল্লেখ্য যে, উত্তরাধিকার বা পিতৃত্ব দাবি মামলাগুলো পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী জজ কোর্টে নিষ্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও ভূমি আপিল বোর্ড ও উচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়ায়। মামলার দীর্ঘসূত্রিতা ও নারী-প্রতিকূল আইনি ব্যবস্থার কারণে সহায় সম্বলহীন নারীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হন বেশি।

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থায় আদিবাসী পাহাড়ি নারী

নারী ও পরিবেশের সম্পর্ক চিরকালের। সামাজিক বনায়ন, বাণিজ্যিক বনায়ন, ইকোপার্ক ইত্যাদি কারণে পরিবেশের যে বিপর্যয় ঘটছে তার সবচেয়ে বড়ো শিকার বাংলাদেশের আদিবাসী নারী। পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে বাঙালি নারীর তুলনায় আদিবাসী নারীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ তাঁরা জ্বালানি, খাবার (পাহাড়ি আলু, বাঁশের কচি) সংগ্রহ করতে অনেকটাই বনের ওপর নির্ভরশীল। আদিবাসী নারীরা বনের ওপর বেশিমাত্রায় নির্ভরশীল হওয়ার কারণে বন/পরিবেশ ধ্বংসের প্রধান শিকার হচ্ছেন তাঁরাই। যে বন ছিল আদিবাসী মানুষের তথা আদিবাসী নারীর স্বাধীন বিচরণভূমি, সেখানে আজ তাঁরা অধিকারহীন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। বাণিজ্যিক কারণে পাহাড়ে ফলনের পরিবর্তন হচ্ছে। আগে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ে আনারসের চাষ হতো। দেখা যেত, আনারসের পাশাপাশি ওই পাহাড়গুলোতে অন্যান্য ফলজ বনজ ও ঔষধি গাছ জন্মাত। কিন্তু বর্তমানে অধিক মুনাফা পাওয়ার আশায় এসব পাহাড়ে ইউকিলিপটাস, অ্যাকেশিয়া, কলা, তামাকসহ ব্যাপক হারে বিদেশী গাছ লাগানো হচ্ছে। অন্যদিকে পারিবারিক আয়ে নারীর যে ভূমিকা (জ্বালানি, ঔষধ, খাবার) তাতে এই পরিস্থিতি মারাত্মক কুপ্রভাব ফেলছে।[৩২]

অনেকেই তাদের ঐতিহ্যগত আয়ের পথ ছেড়ে স্বল্প মজুরির নির্মাণ শ্রমিক বা অন্য কোনো কাজ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। যার সাথে তাঁর কোনো পূর্ব পরিচিতি ছিল না। এখানে নারী-পুরুষের ভূমিকা দুইরকম। পুরুষেরা অর্থ উপার্জনের জন্য প্রাকৃতিক বন ধ্বংস করছেন, অন্যদিকে নারী বন ধ্বংসের কারণে জীবনধারণের জন্য আরো কঠোর পরিশ্রম করছেন। যার ফলে নারী শারীরিক ও মানসিকভাবে হচ্ছেন নিপীড়িত ও নির্যাতিত। বন-ভূমি-জলের সাথে নারীদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। তাই বন-ভূমি-জলমহাল হারানোর প্রভাব আদিবাসী নারীদের ওপর পড়ে সবচেয়ে বেশি।

[৩২] সকল প্রকার বৈষম্য থেকে আদিবাসী নারীদের রক্ষা করতে হবে, দিলারা রেখা, জুম পাহাড়ের জীবন, (মঙ্গল কুমার চাকমা, সোহরাব হাসান ও আবদুল আওয়াল সম্পাদিত), গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ঢাকা, মে ২০০৮

সামরিক কাজে পাহাড়ভূমি

সামরিক কাজে ব্যবহারের জন্য সরকার কেবল বান্দরবান পার্বত্য জেলায়ই ৭৫,৬৮৬ একর পাহাড়ভূমি অধিগ্রহণ করেছে।[৩৩] এই অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনো আলোচনা হয়নি। আইন অনুসারে পার্বত্য জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো ভূমি অধিগ্রহণ করা যায় না। ক্ষতিগ্রস্তরা অভিযোগ করেছে যে, অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি। তাদের সাথে কোনো আলোচনা করা হয়নি। এই অধিগ্রহণের ফলে হাজার হাজার আদিবাসী অধিবাসী নিজ বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছেন এবং প্রথাগত জুমভূমি হারিয়ে তাদের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়ছে। ইতোমধ্যে বিশেষ করে রুমা সেনানিবাস ও সুয়ালক গোলন্ডাজ ও পদাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য অধিগ্রহণকৃত ভূমি থেকে শত শত আদিবাসী পাহাড়ি ও স্থায়ী বাঙালি অধিবাসী উচ্ছেদ হওয়া ও তাদের মানবেতর জীবন সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় অনেক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

ভূমি ইজারা ও জুমভূমি

আদিবাসী জীবনযাত্রার ওপর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব সৃষ্টিকারী একটি পদক্ষেপ হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে বাঙালি অধিবাসীদের কাছে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বা শিল্প স্থাপনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে পাহাড়ভূমির ইজারা প্রদান। কেবল বান্দরবান জেলায়ই ৪০,০৭৭ একর ভূমির ১৬০৫টি প্লট ইজারা প্রদান করা হয়েছে বহিরাগতদের কাছে।[৩৪] এই পাহাড়ভূমিগুলো ছিল মূলত আদিবাসীদের জুমভূমি ও যৌথ মৌজা বন। ইজারা প্রদানের ফলে শত শত আদিবাসী পরিবার প্রথাগত জুমচাষ ও গৃহস্থালির জন্য বনজ সম্পদ আহরণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সার্বিকভাবে তাদের জীবনযাত্রা বিপন্ন হয়ে পড়ছে। ভূমি ইজারাদাররা আদিবাসী জুমচাষীদের জুমচাষে বাধা দিচ্ছে এবং তাদের ওপর সন্ত্রাসী দিয়ে হামলা করছে। ইজারা নেয়া এসব পাহাড়ভূমির বরাতে ইজারাদাররা ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ নিয়েছে। তারা ইজারা নিলেও অধিকাংশ পাহাড়ভূমি অনাবাদি অবস্থায় রেখেছে অথবা চুক্তি ভঙ্গ করে অন্য কাজে ব্যবহার বা অন্যের নিকট অবৈধভাবে বিক্রি করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী এসব ইজারা বাতিলের বিধান রয়েছে। কিন্তু সরকার আজ অবধি এই বিধান কার্যকর করেনি। পক্ষান্তরে এই বিধান লঙ্ঘন করে তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকরা এখনো ইজারা প্রদান অব্যাহত রেখেছেন।[৩৫]

সংরক্ষিত বন ঘোষণা ও জুমভূমি

বনবিভাগ পার্বত্য চট্টগ্রামের রক্ষিত ও অশ্রেণিভুক্ত বনাঞ্চলের ২,১৮,০০০ একর ভূমি রিজার্ভ ফরেস্ট হিসেবে ঘোষণা করে। এসব ভূমির মধ্যে প্রান্তিক আদিবাসী কৃষকের রেকর্ডীয় বসতভিটা ও পাহাড় ভূমি, বন্দোবস্তী প্রক্রিয়াধীন কৃষিজমি এবং যৌথভাবে ব্যবহৃত ঐতিহ্যগত বন ও চারণভূমি রয়েছে। এই সংরক্ষিত বন ঘোষণার ফলে এ অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর জীবনধারার ওপর

---

[৩৩] দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ জুলাই ২০০৭, কুররাতুল আইন তাহমিনা

[৩৪] A Compilation of list of leasees of Bandarban district by CHT Affairs Ministry, 2005

[৩৫] দৈনিক সমকাল, ২৪-৩১ আগস্ট এবং ১-১২ সেপ্টেম্বর ২০০৯

বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। অশ্রেণিভুক্ত বনাঞ্চলকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণার বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা তীব্র বিরোধিতা করে আসছে। উক্ত ঘোষণা বাতিলের দাবি নিয়ে ১৯৯৮ সালের আগস্টে আদিবাসী নেতৃবৃন্দ তৎকালীন বন ও পরিবেশ মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। মন্ত্রী মহোদয় সেসব ঘোষণা স্থগিতকরণের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা এখনো কার্যকর করা হয়নি।

বন ব্যবস্থাপনা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩৩ নম্বর ধারায় পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলি হিসেবে "সরকার কর্তৃক রক্ষিত নয় এই প্রকার বন সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ" বিষয়টি হস্তান্তরের বিধান করা হয়। পার্বত্য জেলা পরিষদের এই হস্তান্তরিত বিষয়টিও এখনো কার্যকর করা হয়নি। এই ধারা অনুযায়ী রক্ষিত বন ব্যতীত অন্য সকল বন যথা সংরক্ষিত ও অশ্রেণিভুক্ত বন জেলা পরিষদের আওতাধীন বিষয়। কিন্তু বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে লঙ্ঘন করে কেবল অশ্রেণিভুক্ত বনকে পার্বত্য জেলা পরিষদের এবং রক্ষিত ও সংরক্ষিত বনকে বনবিভাগের আওতাধীন বলে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় থেকে সার্কুলার জারি করা হয়েছে। এটা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনেরই বরখেলাপ। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে জনপ্রতিনিধিত্ব তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কাছে বন ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়টি হস্তান্তরিত না হওয়ার কারণে এই ধ্বংসযজ্ঞ ত্বরান্বিত হয়েছে বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেন। যার প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী হচ্ছেন আদিবাসী পাহাড়ি নারীসমাজ।

সামাজিক বনায়ন ও পাহাড়ি নারী

বন ধ্বংস রোধকল্পে সরকার নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সামাজিক বনায়ন প্রকল্প। সরকার ব্রিটিশ আমলে প্রবর্তিত ১৯২৭ সালের বন আইন সংশোধন করে ২০০০ সালে, যা বন (সংশোধন) আইন নামে পরিচিত। বনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য করা হলেও এই আইনকে পরিবেশবিরোধী এবং গণবিরোধী বলে ব্যাপকভাবে সমালোচনা করা হয়। এই আইনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং আদিবাসীদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ও ভূমি অধিকারের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নেয়া হয়নি। সংশোধিত বন আইনের ২৮(৪) ও ২৮(৫) ধারা অনুসারে সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০৪ প্রবর্তন করা হয়। এই বিধিমালায় সামাজিক বনায়ন প্রকল্পে সুবিধাভোগী হিসেবে ভূমিহীন ব্যক্তি ও দুস্থ নারীদের পাশাপাশি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে বলে বিধান করা হয়। কিন্তু আইনে তাদেরকে ভূমির অধিকার প্রদানের কোনো বিধান নেই এবং বনবিভাগের কর্মকর্তাদের এতই ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে, তাদের মর্জির ওপর নির্ভর করবে সুবিধাভোগীদের ভবিষ্যৎ। যে কোন মুহূর্তে যেকোনো অজুহাতে বনবিভাগের কর্মকর্তারা সুবিধাভোগীদের বাদ দিয়ে দিতে পারবেন।[৩৬]

[৩৬] Natural Resource Management Country Studies (Bangladesh Report) by UNDP-RIPP

বনবিভাগের হয়রানি ও পাহাড়ি নারী

আদিবাসীরা বনবিভাগের নানা হয়রানির শিকার হন। তার অন্যতম হচ্ছে হয়রানিমূলক মামলার শিকার হওয়া। প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর আদিবাসীদের অধিকার কিংবা বনজ সম্পদ আহরণে আদিবাসীদের প্রথাগত অধিকার বন আইনে স্পষ্টভাবে স্বীকৃত না থাকার কারণে বা বনবিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এ ধারণা না থাকার কারণে আদিবাসীরা এরকম হয়রানির শিকার হন। বনজ সম্পদ উজাড় করার জন্য কখনই আদিবাসীরা দায়ী নন, কিন্তু বনকর্মকর্তারা বনের সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য আদিবাসীদের নির্যাতন করেন; মিথ্যা মামলায় জড়িত করে হয়রানি করেন। একজন আদিবাসীর বিরুদ্ধে শত শত মামলা দায়ের করার ঘটনাও ঘটেছে। শুধু তাই নয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরও অসংখ্য আদিবাসীর জীবন অকালে ঝরে গেছে বনরক্ষীদের গুলিতে। আদিবাসীদের ওপর বনবিভাগের এ ধরনের নির্যাতন সমতল ও পাহাড়ি উভয় অঞ্চলেই দেখা যায়।

ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোনো জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর না করা এবং সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর না করার বিধান করা হয়েছে। 'ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা' পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন বিষয় করা হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি ভূমি কমিশন গঠন করে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি তথা বসতি স্থাপনকারী বাঙালি কর্তৃক জবরদখলকৃত আদিবাসী পাহাড়িদের ভূমি প্রত্যর্পণের বিধান করা হয়েছে। অধিকন্তু চুক্তিতে রাবার চাষ ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে অস্থানীয়দের কাছে বরাদ্দ প্রদানকৃত ভূমি ইজারা বাতিল করার বিধান করা হয়েছে।

কিন্তু এসব কোনো বিষয়ই এখনো কার্যকর করা হয়নি। আজ অবধি পার্বত্য জেলা পরিষদের কাছে ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা হয়নি। পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনকে অগ্রাহ্য করে জেলা প্রশাসকরা নামজারি, অধিগ্রহণ, ইজারা ও বন্দোবস্ত প্রদান প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন। অপরদিকে ভূমি কমিশন ভূমি নিষ্পত্তির জন্য বিগত ১২ বছরেও কোনো কাজ শুরু করেনি। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে "পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১" প্রণীত হয়। কিন্তু উক্ত আইনে চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক ১৯টি ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা আজও সংশোধিত হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে ভূমি, বন ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংক্রান্ত সমস্যাগুলো দিন দিন আরো জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। ভূমি ও বন নিয়ে বিরোধের কারণে এ অঞ্চলের হরহামেশাই সাম্প্রদায়িক হামলা ও উত্তেজনা দেখা দেয়। আদিবাসী পাহাড়ি গ্রামে হামলা, অগ্নিসংযোগ, হত্যা, ধর্ষণ, অপহরণের মতো অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে চলেছে। আর এতে আদিবাসী পাহাড়ি নারীরাই প্রত্যক্ষভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হচ্ছেন।

২০০৬ সালের মহালছড়ির মাইসছড়ি এলাকায় ভূমি দখলের উদ্দেশ্যে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলায় ৪ জন আদিবাসী নারী ধর্ষণের ঘটনার খবর এসেছে পত্রপত্রিকায়। অতিসম্প্রতি ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯ খাগড়াছড়ি জেলার সিন্দুকছড়ি এলাকায় বাগান-ভূমি দখলের উদ্দেশ্যে ভূমির মালিক বিভিষণ ত্রিপুরার স্ত্রী পণেমালা ত্রিপুরাকে (৫০) অপহরণের পর হত্যা করা হয়। বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশের মতো

পার্বত্যাঞ্চলের আদিবাসী নারীদের ওপর সংঘটিত নির্যাতনের অন্যতম কারণ হলো জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা। এ ধরনের সহিংসতা আদিবাসী নারীদের নিরাপত্তাহীনতাকে চরমভাবে প্রভাবিত করে আসছে।

উৎপাদনে আদিবাসী পাহাড়ি নারী

আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রান্তিকীকরণ সত্ত্বেও আদিবাসী নারীরা বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আদিবাসী নারীদের ওপর বিশ্বায়নের প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী। বংশানুক্রমিক আবাস-এলাকা থেকে সশরীরে স্থানান্তর অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। অন্যান্যের মধ্যে বাণিজ্যিক বনায়ন, কাঠ আহরণ, বাঁধ নির্মাণ ও জ্বালানি প্রকল্প ইত্যাদির মাধ্যমেও বিশ্বায়নের আগ্রাসন ব্যাপকতর হচ্ছে। ভূমি হারানোর ফলে আদিবাসী নারীরা হারিয়ে ফেলছেন প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণও, জন্মলগ্ন থেকেই যা তাদের বেঁচে থাকার মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে।[৩৭]

এখনো অনেক পরিবারে নারীদেরকে কেবল বুনন, রান্নাবান্না, সন্তান লালনপালন, গৃহস্থালির কাজের উপযোগী বলে বিবেচনা করা হয়। পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষের প্রাধান্য আদিবাসী নারীর তুলনায় অনেক বেশি। তবে বিভিন্ন বৈষম্য সত্ত্বেও পাহাড়ি সমাজে নারীদের গুরুত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈষম্যমূলক অনেক প্রাচীন প্রথা ধীরে ধীরে অপসৃত হচ্ছে। বিভিন্ন পেশায় ও সংস্থায়ও নারীর অংশগ্রহণ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে।

আদিবাসী সমাজে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে পুরুষের তুলনায় নারীদের সম্পৃক্ততা অনেক বেশি। কিন্তু পরিবারে, সমাজে ও জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অবদান আজো অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে। আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) মতে, বিশ্বের ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়েসি ৪৫ শতাংশ নারী এখন অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় এবং মুসলিম দেশগুলোতে নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে নিরুৎসাহিত করা হলেও এ ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও শ্রমবাজারে নারীর ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি সত্ত্বেও আদিবাসী নারীর অর্থনৈতিক অধিকার এখনো নিশ্চিত হয়নি। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আদিবাসী পাহাড়ি নারীরা আজো বহুমুখী বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। যেমন ১. অসম মজুরি, ২. প্রশিক্ষণের অসম সুযোগ, ৩. ঋণ ও উৎপাদনমূলক কাজে সম্পদ লাভের অসম সুযোগ, ৪. পেশা নির্দিষ্টকরণ/বিভাজন ইত্যাদি। এছাড়াও বিশ্বের সর্বত্র এখনো নারীর কাজ বা পুরুষের কাজ চিহ্নিত করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও শ্রমকে লিঙ্গীয় ভিত্তিতে বিভাজন করা হয়ে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়, যা আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের প্রবলভাবে প্রভাবিত করছে।[৩৮]

---

[৩৭] আদিবাসী নারীদের নিরাপত্তাহীনতা : পার্বত্য চট্টগাম প্রেক্ষিত, ড. সাদেকা হালিম, জুম পাহাড়ের জীবন, (মঙ্গল কুমার চাকমা, সোহরাব হাসান ও আবদুল আওয়াল সম্পাদিত), গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ঢাকা, মে ২০০৮

[৩৮] পার্বত্য নারীর পাঁচমিশেলী গপ্‌পো, টুকু তালুকদার; জাগরণ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস সংখ্যা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি, রাঙ্গামাটি, ৮ মার্চ ২০০৫

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আদিবাসী পাহাড়ি নারী

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারি উন্নয়নের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়নের ক্ষেত্র হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিত্তিক স্থানীয় বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (এনজিও) গড়ে ওঠে। তারই অংশ হিসেবে অনেক বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী নারী সংগঠনও পার্বত্য চট্টগ্রামে জন্মলাভ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নারী সংগঠনের মধ্যে খাগড়াছড়ি জেলার খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি, মিলনপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি ও আনন্দনগর মহিলা সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলার গর্জনতলী মহিলা সমিতি, জুমবী মহিলা কল্যাণ সমিতি, সংবী মহিলা কল্যাণ সমিতি, পেরাছড়ি মহিলা কল্যাণ সমিতি ও রান্যা নারী সংঘ এবং বান্দরবান জেলায় বলিপাড়া নারী কল্যাণ সমিতি ও অনন্যা নারী কল্যাণ সংগঠন সক্রিয়ভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া আরো অনেক আদিবাসী পাহাড়ি নারী সংগঠন রয়েছে, যারা নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। আবার এমনও কিছু সংগঠন আছে, যাদের কোনো সক্রিয় প্রকল্প নেই।

এসব নারী সংগঠন নারীসমাজের সক্ষমতা গড়ে তোলা, তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা, নারীর শিক্ষা প্রসার, নারীর স্বাস্থ্যসেবা ও পরিচর্যা, নারীর কর্মসংস্থান, গ্রামীণ দুস্থ নারীর আয়বর্ধনমূলক ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে উৎসাহিত করা, পাহাড়ি নারীর ওপর চলমান পারিবারিক, সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা ইত্যাদি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ডানিডা, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প, জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন নারী উন্নয়ন সংগঠন ও সহযোগী সংগঠনসহ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠীর অর্থায়নে এসব আদিবাসী পাহাড়ি নারী সংগঠনগুলো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে। বিশেষ করে ডানিডা, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অনুকূলে এসব কর্মসূচি-সহায়তা দিয়ে চলেছে বলে দাবি করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের বদৌলতে বেসরকারি উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠার ফলেই এসব নারী সংগঠনের জন্ম এবং কাজের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। কাজেই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্বেচ্ছাসেবী নারী সংগঠনসহ বেসরকারি উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিরই প্রত্যক্ষ ফসল বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-উত্তরকালে সীমিত পরিসরে হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নারী সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত নারী সদস্য, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান, পৌরসভার সংরক্ষিত নারী কমিশনারদের অংশগ্রহণ রয়েছে এবং নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তাঁরা যথাসাধ্য ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

তিন পার্বত্য জেলায় সরকারের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরও কাজ করে যাচ্ছে। এই অধিদপ্তর মূলত নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনের জন্য সেলাই ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম, দল (সমিতি) গঠন, বিধবা ভাতা ইত্যাদি কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, সমাজসেবা বিভাগ ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য নানা প্রশিক্ষণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে আদিবাসী পাহাড়ি

নারীদের জন্য পৃথক প্রকল্প না থাকলেও এতে আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রয়েছে।

১৯৯১ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ দেশের ৬.৭০ শতাংশের বিপরীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে ১২.৬৭ শতাংশ।[৩৯] এক্ষেত্রে আদিবাসী পাহাড়ি নারী ও বাঙালি নারীদের মধ্যে পৃথক কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, জাতীয় স্তর থেকে প্রায় দ্বিগুণ হওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ উৎপাদন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আদিবাসী পাহাড়িদের ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনপিডি)-এর প্রোমোশন অব ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কনফিডেন্স বিল্ডিং প্রকল্পে নারীর ক্ষমতায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম নারী সংগঠন নেটওয়ার্ক গঠনে সহায়তা দিচ্ছে। এ প্রকল্পের অধীনে এ যাবৎ মূলত প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কাজ বাস্তবায়ন চলছে। নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিশ্ব খাদ্য সংস্থার গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, ভিজিডি, নগদ অনুদান ইত্যাদি প্রকল্পগুলোর উপকারভোগী হচ্ছেন নারীরা।

বান্দরবান জেলার অনন্যা নারী সংগঠন আদিবাসী নারী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। খাগড়াছড়ি জেলার খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি আদিবাসী পাহাড়ি নারীর ক্ষমতায়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সহিংসতা প্রতিরোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং এসব প্রকল্পের মোট ১৪০৫ জন নারী উপকার লাভ করেছে। রাঙ্গামাটি জেলার গর্জনতলী মহিলা কল্যাণ সমিতি স্বাস্থ্য ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রোগ্রেসিভ কোমর তাঁত প্রকল্প পরিচালনা করছে। স্থানীয় সাধারণ এনজিও, যেমন জাবারাং, তৈমু, গ্রাউস ও হিলেহিলি নারীদের জন্য আত্মকর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা ও ক্ষমতায়ন ইত্যাদি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

কর্মসংস্থানে আদিবাসী পাহাড়ি নারী

সংবিধানের ২৯(২) অনুচ্ছেদের 'ক' উপধারায় বলা হয়েছে যে, নাগরিকদের যেকোনো অনগ্রসর অংশ যাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারে, সে উদ্দেশ্যে তাঁদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।

সংবিধানের উক্ত অনুচ্ছেদ বলে সরকারি চাকুরিতে আদিবাসীদের জন্য ৫% কোটা সংরক্ষিত আছে। কিন্তু তা যথাযথভাবে কার্যকর হয় না। ১৯৭২ থেকে এ যাবৎ বিসিএস-এর ২২টি ব্যাচে মোট ২৯,৬৬৭ জন ক্যাডার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ৫ শতাংশ হারে হিসেব করলে মোট ১,৪৮৩ জন

[৩৯] Mapping Chittagong Hill Tracts Census Indicators, 2001 & Trends (Bangladesh), Geographical Information System (GIS) Unit, Local Government Engineering Department (LGED), Bangladesh, International Centre for integrated Mountain Development (ICIMOD), Nepal and Mountain Environment and Natural Resources Information Systems (MENRIS), April 2006

আদিবাসী ব্যক্তি নিয়োগ পাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে এই সংখ্যা অনেক অনেক নিচে। বলাই বাহুল্য যে, এক্ষেত্রে আদিবাসী নারীদের নিয়োগের চিত্র আরো হতাশাব্যঞ্জক।[৪০]

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের চাকুরি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সরাসরি কোনো বিশেষ বিধান নেই। তবে পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১০ নম্বর ধারায় আদিবাসী পাহাড়িদের জন্য সরকারি চাকুরিতে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখার বিধান করা হয়েছে। এছাড়া চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১৮ নম্বর ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণির কর্মচারী পদে পাহাড়িদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগের বিধান রয়েছে।

তবে এই বিধান থাকলেও তা যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ থেকে প্রস্তাব করা হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট সকল বিধিমালা ও প্রবিধানমালায় এখনো অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং বাস্তবক্ষেত্রেও অদ্যাবধি অনুসরণ করা হয়নি। ফলে এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন চাকুরিতে বহিরাগতরা নিয়োগ লাভ করে চলেছে, যার সরাসরি ক্ষতির শিকার হচ্ছে আদিবাসী পাহাড়ি নারীরা।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) মতে, বিশ্বের শতকরা ৪৫ জন নারী এখন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়। এর মধ্যে আদিবাসী নারীরা অংশগ্রহণ করে শতকরা ৯০ শতাংশ কৃষিতে। বলাবাহুল্য, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও শ্রমবাজারে নারীর ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি সত্ত্বেও নারীর অর্থনৈতিক অধিকার এখনো নিশ্চিত হয়নি। ফলে দেখা যায়, অসম মজুরি, ঋণ ও উৎপাদনমূলক সম্পদ লাভের অসম সুযোগ, পেশার বিভাজন। অর্থনৈতিক অসাম্য ও বৈষম্যমূলক সামাজিক আচরণ সমাজে নারীদের অধীনস্থ অবস্থাকেই পাকাপোক্ত করে।

আদিবাসী নারীরা অর্থনৈতিকভাবে মোটেও স্বাবলম্বী নন। পরিবারে নারীকে একাধারে স্ত্রী, মাতা, অর্থ উপার্জনকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হয়। সন্তান জন্মদান, সন্তানের পরিচর্যা থেকে শুরু করে গৃহস্থালি কাজকর্ম, কৃষি/জুমচাষ, সর্বোপরি কাপড় বোনাসহ সব কাজই নারীকে করতে হয়। কিন্তু দেখা যায়, সকল কাজ করার পরও, বাজারে অভিগম্যতা থাকার পরেও পুরুষতান্ত্রিকতার বেড়াজাল থেকে নারীরা বের হয়ে আসতে পারেননি। পরিবারের সকল সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় পুরুষের মতামতকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। দেশে নারী-পুরুষের মধ্যে মজুরি বৈষম্য প্রকট। আদিবাসীদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরো মারাত্মক। একই ধরনের পরিশ্রম করার পর নারী পান পুরুষের অর্ধেক মজুরি।

যেহেতু শিক্ষাক্ষেত্রে আদিবাসী জনগোষ্ঠী পিছিয়ে আছে, তাই চাকুরিতে এখনো সংখ্যায় তারা খুবই নগণ্য। তারপরও বর্তমানে অফিস আদালতে আদিবাসীদের উপস্থিতি যতটাই দেখা যায়, সেখানে

[৪০] Situation of Indigenous Women and ILO Covention on Discrimination by Dr. Sadeka Halim, Sanghati 2007, Bangladesh Indigenous Peoples Forum, 9 August 2007

আদিবাসী নারী একেবারেই হাতে গোনা। বিশ্বায়নের ফলে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় আদিবাসী জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারীরা কাজের সন্ধানে শহরমুখী হয়েছে।[৪১] জানা যায় যে, চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াজাত অঞ্চলসহ চট্টগ্রামের বিভিন্ন শিল্পকারখানায় প্রায় ২০,০০০ পাহাড়ি শ্রমিক কর্মরত আছে। অপরদিকে কেবল ঢাকার সাভারে অবস্থিত রপ্তানি প্রক্রিয়াজাত অঞ্চলসহ ঢাকা অঞ্চলের বিভিন্ন শিল্পকারখানায় প্রায় প্রায় ৭ থেকে ১০ হাজার পাহাড়ি শ্রমিক কর্মরত আছে। এসব পাহাড়ি শ্রমিকদের প্রায় অর্ধেকের বেশি নারী। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ঢাকা ও চট্টগাম ইপিজেডসহ দেশের বিভিন্ন গার্মেন্ট কারখানায় পার্বত্য চট্টগ্রামের নারীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিজ সমাজ, সংস্কৃতি, পরিবেশ ও আত্মীয়স্বজন দূরে থাকার ফলে এদের ওপরে সামাজিকভাবে নানা বিরূপ প্রভাব পড়ছে বলে বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে। এছাড়া ব্যাপকভাবে না হলেও কিছু ক্ষেত্রে বাঙালি সহকর্মী দ্বারা এরা যৌন হয়রানিসহ নানা বিরূপ আচরণের সম্মুখীন হয়ে থাকে।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, দেশে আদিবাসী নারীদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে চাকুরির চাহিদা তৈরি হয়েছে। যেমন বিউটিগার্ল হিসেবে বিউটি পার্লার, সেবিকা হিসেবে হাসপাতাল ও ক্লিনিক এবং রিসেপসনিস্ট হিসেবে বেসরকারি অফিস-আদালত প্রভৃতিতে। কিন্তু এসব কাজে তাদের খুব কম পারিশ্রমিক দেয়া হয়। এর ফলে পাহাড়ি নারীরা একদিকে যেমন মজুরি বৈষম্যের শিকার হচ্ছে, অন্যদিকে তারা হারাচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা। তারা পরিবারে সচ্ছলতা আনার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করছে, কিন্তু তাদের প্রতি সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি মোটেও সুখকর নয়।[৪২]

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে নারী শিক্ষকদের প্রাধান্য দেয়া হয়। কিন্তু এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের নারীরা জাতীয় পর্যায় থেকে পিছিয়ে আছে। ২০০১-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে নারী শিক্ষকের হার ৩৭.৬৪ শতাংশ, আর এর বিপরীতে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন পার্বত্য চট্টগ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নারী শিক্ষকের হার ২৮.৯৬ শতাংশ। ২০০১-এর পরিসংখ্যান অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ৩,৩০৪ জন শিক্ষকের বিপরীতে নারী শিক্ষক মাত্র ৯৫৭ জন।[৪৩] পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ কর্তৃক ১৯৯৯-২০০৮ সালের মধ্যে মোট ১০৮ জন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে, তন্মধ্যে ৩৫ জন নারী শিক্ষক। সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে ৮৮৮ জন, তন্মধ্যে নারী শিক্ষক ৪৫৮ জন। উক্ত পরিসংখ্যানে আদিবাসী পাহাড়ি নারী শিক্ষক ও বাঙালি নারী

---

[৪১] The ILO Convention on Indigenous and Tribal Populations, 1957 and the Laws of Bangladesh: A Comparative Review, Raja Devasish Roy, PRO 169, International Labour Standards Department, ILO Geneva and ILO Office, Dhaka, 2009

[৪২] সকল প্রকার বৈষম্য থেকে আদিবাসী নারীদের রক্ষা করতে হবে, দিলারা রেখা, জুম পাহাড়ের জীবন, (মঙ্গল কুমার চাকমা, সোহরাব হাসান ও আবদুল আওয়াল সম্পাদিত), গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ঢাকা, মে ২০০৮

[৪৩] Mapping Chittagong Hill Tracts Census Indicators, 2001 & Trends (Bangladesh), Geographical Information System (GIS) Unit, Local Government Engineering Department (LGED), Bangladesh, International Centre for integrated Mountain Development (ICIMOD), Nepal and Mountain Environment and Natural Resources Information Systems (MENRIS), April 2006

শিক্ষকের পৃথক কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে বাস্তব অভিজ্ঞতায় বাঙালি নারী শিক্ষকের চেয়ে আদিবাসী পাহাড়ি নারী শিক্ষকের হার অনেক বেশি হবে বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেন।

বান্দরবান জেলার অনন্যা নারী সংগঠন, খাগড়াছড়ি জেলার খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলার গর্জনতলী মহিলা কল্যাণ সমিতি ও প্রোগ্রেসিভ এই চারটি নারী সংগঠনে পরিচালক পদে মোট ২৩ জনের মধ্যে ১০ জন নারী কর্মরত রয়েছেন এবং কর্মী পদে মোট ৯৬ জনের মধ্যে ৪৯ জন নারী কাজ করছেন। এছাড়া স্থানীয় সাধারণ এনজিওর মধ্যে তৃণমূল, জাবারাং, তৈমু, গ্রাউস ও হিলেহিলি'র স্টাফ সংখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, পরিচালক পদে মোট ৪৪ জনের মধ্যে ১৪ জন নারী এবং কর্মী পদে মোট ৪৫৭ জনের মধ্যে ২৩০ জন নারী কর্মরত আছেন। রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত বিশ্ব খাদ্য সংস্থার অফিসে ম্যানেজারিয়াল পদে মোট ১১ জনের মধ্যে ৫ জন নারী। তবে নন-ম্যানেজারিয়াল পদে ৬ জনের মধ্যে কোনো নারীকর্মী নেই।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের বদৌলতে পার্বত্য চট্টগ্রামে এনজিও কার্যক্রমের অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠেছে বলেই এসব নারীকর্মীরা কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করেছেন। এটা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির প্রত্যক্ষ ফল বলা যায়।

শিক্ষায় আদিবাসী পাহাড়ি নারী

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১০ নম্বর ধারা মোতাবেক চাকুরি ও উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত সরকার কর্তৃক পাহাড়িদের জন্য সরকারি চাকুরি ও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখা, এ লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করা, বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করার বিধান রয়েছে।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের জন্য কোটা সংরক্ষিত আছে। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে (বিসিএস) পাহাড়িদের কোটা সংরক্ষিত থাকলেও তা যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকারি কোনো বৃত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অধিকন্তু ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'উপজাতীয় কোটা'কে 'পার্বত্য কোটা' হিসেবে রূপান্তরিত করে বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদেরও উক্ত কোটায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

ইউনিসেফের জরিপ অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষার হার বেড়েছে। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পুরুষের শিক্ষার হার জাতীয় পর্যায়ের সমান হলেও নারীশিক্ষার হার অনেক পিছিয়ে। তার মধ্যে অধিকতরভাবে পিছিয়ে রয়েছে আদিবাসী নারীরা। শিক্ষায় পার্বত্য চট্টগ্রামের নারীদের সুযোগ লাভ সম্পর্কে তথ্য নিয়ে জানা গেছে, দারিদ্র্য ও আর্থ-সামাজিক পটভূমির কারণে ছেলেমেয়েদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে মেয়েরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশি। দারিদ্র্য ছাড়াও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য তার অন্যতম কারণ। অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থার ফলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মেয়েদের ভর্তির হার ছেলেদের তুলনায় বেশি, কিন্তু মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েরা আর এগোতে পারে না। প্রত্যন্ত ও গ্রাম্যাঞ্চলে নারীশিক্ষাকে

মানবাধিকারের দিক থেকে বিবেচনা না করে কম গুরুত্বপূর্ণ ও বিলাসিতার বিষয় মনে করা হয়। পারিবারিক আয়ের ওপর নারীর শিক্ষালাভের সুযোগ নির্ভর করছে।

২০০১ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে আদিবাসী নারীদের সাক্ষরতার হার তাদের পুরুষদের তুলনায় অনেক কম। ২০০১-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষার হার ৪৫.৩ শতাংশের বিপরীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষার হার ৩৭.৩৫ শতাংশ। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুরুষের শিক্ষার হার ৪৯.৬ শতাংশের বিপরীতে নারীশিক্ষার হার ৪০.৮ শতাংশ।[৪৪] এই পরিসংখ্যানে আদিবাসী পাহাড়ি নারী ও বাঙালি নারীদের মধ্যকার শিক্ষার হার পৃথকভাবে দেখানো হয়নি। তবে পাহাড়ি নারীকর্মীদের মতে, এই হার বাঙালি নারীর চেয়ে পাহাড়ি নারীর শিক্ষার হার অনেক নিচে হবে। ইউনিসেফ বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ২০০৪-এ মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব এবং শিক্ষায় বিনিয়োগের বহুবিধ সুফল সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে, যা স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নারীর সহিংসতার ঝুঁকি কমানোর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ১০ জন নারীর মধ্যে ৭ জন নিরক্ষর অর্থাৎ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত।[৪৫] কতক ক্ষেত্রে কন্যা সন্তানের লেখাপড়ায় উৎসাহ দেয়া হয় না। আদিবাসী পাহাড়িদের মধ্যে ছেলেশিশুর তুলনায় মেয়েশিশুদের স্কুলে গমনের হার কম, পক্ষান্তরে ছেলেশিশুর তুলনায় মেয়েশিশুদের অল্পবয়সে স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার বেশি।[৪৬] পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেও শিক্ষার হারে তারতম্য রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী ভেদে ১১-১২ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার হারে তারতম্য রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু গ্রামে পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায় যে, চাকমা জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার হার বেশি (৩৬.২ শতাংশ), আর সবচেয়ে কম শিক্ষার হার হচ্ছে স্বল্প জনসংখ্যাসম্পন্ন আদিবাসী ম্রো জাতিগোষ্ঠীর বেলায় (২.৯ শতাংশ)। এই গবেষণা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার হার সম্পর্কে সামগ্রিক চিত্রের প্রতিফলন ঘটায় না। কারণ এই গবেষণা কেবল কতিপয় গ্রামে পরিচালিত হয়। তবু আংশিক ধারণা লাভের সুবিধার্থে এই গবেষণার ফলাফল উল্লেখ করা গেল। উল্লেখ্য যে, উক্ত গবেষণায় মারমা জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার হার ২৬.৬ শতাংশ আর ত্রিপুরাদের ১৮.৫ শতাংশ।[৪৭]

উক্ত তথ্য পুত্রসন্তান ও কন্যাসন্তানের শিক্ষার বৈষম্য নির্দেশ করে না। কিন্তু আদিবাসী সমাজেও শিক্ষা ক্ষেত্রে কন্যাসন্তানরা বৈষম্যের শিকার হয়। সাধারণভাবে সমাজে একটি ছেলেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য তৈরি করা হয়। কারণ সে রোজগার করবে। তার রোজগারে বুড়ো বয়সে পিতামাতারা জীবন নির্বাহ করবে, আর মেয়েসন্তানকে হেঁসেলে ঢুকতে হবে, সবার জন্য আহার্য তৈরি করতে হবে। এ সমস্ত কারণে বিদ্যালয়ে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার, অশিক্ষিত থেকে যাওয়ার হার অনেক বেশি।

---

[৪৪] প্রাগুক্ত

[৪৫] Gender Profile: The Chittagong Hill Tracts, CHTDF-UNDP 2005

[৪৬] CHT Livelihood Security Assessment Report, CARE-Bangladesh, Sutter, Phil, 2000

[৪৭] Counting the Hills, Assessing Development in Chittagong Hill Tracts, edited Mohammad Rafi and A Mushtaque R. Chowdhury, UPL, 2001

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে নারীশিক্ষার সরাসরি কোনো উল্লেখ নেই। তবে চুক্তিতে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয় দু'টি তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরের বিধান করা হয়। বলাবাহুল্য, ইতোমধ্যে ১৯৮৯ সালের পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়টি তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক এখনো তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের হস্তান্তরিত বিষয় হিসেবে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যকর করা হয়নি। তাই স্বভাবতই বিশেষ করে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার অভাবে আদিবাসী শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষায় চরম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছে।

আদিবাসী ছেলেমেয়েদের স্কুল জীবন থেকে ঝরে পড়ার অন্যতম একটি কারণ ভাষাগত সমস্যা। স্কুলের প্রথম দিনে যখন অপরিচিত বাংলা ভাষায় তাকে পাঠদান করা হয় সে স্বাভাবিকভাবে কিছু না বুঝে স্কুলের প্রথম দিন থেকে কঠিন এক অবস্থায় মুখোমুখী হয়। ফলে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ধীরে ধীরে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। অন্ততঃ প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা হলে শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষার বিষয়বস্তু আরো সহজ ও বোধগম্য হত। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার বিধান করা হলেও তা এখনো কার্যকর হয়নি। এমনকি এ বিষয়টি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি বা জাতীয় শিক্ষানীতিতেও অন্তর্ভুক্ত হয়নি।[৪৮]

মেয়ে সন্তানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার আরেকটি অন্যতম কারণ নিরাপত্তাহীনতা। পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী নারীদের বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার মোকাবিলা করতে হয়। ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সত্ত্বেও সেখানে আদিবাসী নারীদের বাঙালি বসতি স্থাপনকারী ও বাঙালি নিরাপত্তা কর্মীদের দ্বারা অব্যাহত গঞ্জনা ও যৌন হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। পার্বত্য শান্তি চুক্তি অনুসারে সামরিক ক্যাম্পগুলি গুটিয়ে না নেয়ার কারণে এখনো পাহাড়ি ছাত্রীরা চরম নিরাপত্তীনতায় রয়েছে। বিশেষ করে দুর্গম প্রত্যন্ত পর্বতসঙ্কুল অঞ্চলে কিশোরী ও যুবতি মেয়েদের নিরাপত্তার অভাব সবচেয়ে বেশি। তাই অভিভাবকরা অনেকে তাদের মেয়ে সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে নিরুৎসাহিত হন।

আদিবাসীদের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চনার ক্ষেত্রে জাতিগোষ্ঠীভিত্তিক তারতম্য রয়েছে। স্বল্প জনসংখ্যাসম্পন্ন ম্রো, লুসাই, পাংখো, খিয়াং ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা অধিতর দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করে। সুতরাং তাদের কাছে সরকারি শিক্ষার সুবিধা সহজে পৌঁছে না।[৪৯] এক্ষেত্রে সরকারি নিয়মনীতিও বাধা হিসেবে কাজ করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারি নীতি অনুসারে স্কুলের নামে নির্দিষ্ট জায়গা রেজিস্ট্রিকৃত হতে হবে এবং ন্যূনতম ১০০ জন ছাত্রছাত্রী প্রয়োজন হবে (জাতীয় পর্যায়ে ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী দরকার)। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্কুলের নামে জমি রেজিস্ট্রি করায় নানা ধরনের সমস্যা রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে যেখানে ভূমি, বন ও পাহাড় অনেকাংশে সমষ্টিগত সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত, সেখানে স্কুলের নামে

[৪৮] গত ১৮ জুলাই ২০০৮ ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেব ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন কর্তৃক "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঃ আদিবাসী নারী অধিকার" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় পঠিত প্রবন্ধ।

[৪৯] UNLOCKING THE POTENTIAL: Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP), People's Republic of Government of Bangladesh, 2005, p-152

রেজিস্ট্রি করা না করা অনেকটা গৌণ বিষয়। অপরদিকে পাহাড়ি প্রত্যন্ত দুর্গম অঞ্চলের গ্রামগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ১৫/২০টি মাত্র পরিবার নিয়ে গঠিত, সেখানে একগ্রামে ন্যূনতম ১০০ ছাত্রছাত্রী পাওয়া কখনোই সম্ভব হতে পারে না। ফলে সরকারি নীতি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম অঞ্চল, যেখানে সবচেয়ে বেশি শিক্ষাবঞ্চিত স্বল্প জনসংখ্যাসম্পন্ন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী বসবাস করে, সেখানে সরকারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত কঠিন। স্বাভাবিকভাবে স্বল্প জনসংখ্যাসম্পন্ন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে নারীরাই শিক্ষা থেকে সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত হয়ে আসছে।[৫০]

স্বাস্থ্য-চিকিৎসায় আদিবাসী পাহাড়ি নারী

স্বাস্থ্য বিভাগ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত বিষয়। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামেও স্বাস্থ্যসেবা পর্যাপ্ত নয়। জেলা ও উপজেলাগুলো ছাড়া প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে স্বাস্থ্যসেবা নেই বললেই চলে। তাই এ এলাকায় মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি এবং মাতৃত্বজনিত কারণে নারীর স্বাস্থ্যও হুমকির মুখে। বাচ্চারা টিকা পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত দুটো কারণে— ১. স্বাস্থ্যকর্মীরা সময়মতো উপস্থিত থাকেন না এবং ২. মায়েদের অসচেতনতা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল দেশের ম্যালেরিয়াপ্রবণ এলাকা। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় সবচেয়ে বেশি। ডায়রিয়া, হেপাটাইটিস, এনিমিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাবও রয়েছে ব্যাপকভাবে। কিন্তু সে তুলনায় চিকিৎসা-সুবিধা অত্যন্ত কম। উপজেলা হাসপাতালে চিকিৎসকরা অনেক ক্ষেত্রে থাকতে চান না। আর প্রত্যন্ত দুর্গম পাহাড়ি ও গহিন অরণ্যে সরকারি স্বাস্থ্যসেবার কোনো ব্যবস্থা নেই।

শ্রম বৈষম্যের কারণে নারীরা ঘরে-বাইরে এতই ব্যস্ত থাকে যে তাদের ফুরসত মেলে না টিকাজনিত কারণে অসুস্থ শিশুর জন্য বাড়তি সময় ব্যয় করা। এক্ষেত্রে আদিবাসী পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীভেদে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা লাভের ক্ষেত্রে তারতম্য রয়েছে। স্বল্প জনসংখ্যাসম্পন্ন ম্রো, লুসাই, পাংখো, খিয়াং ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা অধিতর দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করে। স্বাভাবিকভাবে এই জাতিগোষ্ঠীর নারীদের পক্ষে মাতৃস্বাস্থ্যসেবাসহ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা লাভ করা সম্ভবপর ওঠে না। এসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জল ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থাও নেই, যার প্রত্যক্ষ শিকার এসব পিছিয়ে পড়া স্বল্প জনসংখ্যাসম্পন্ন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর নারীরা।

পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা, ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা কিংবা স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতার কারণে আদিবাসী নারীর স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি সঙ্কুচিত হয়েছে বলা যায়। স্বাস্থ্য অধিকার থেকে বঞ্চনার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের মধ্যে রক্তশূন্যতার ব্যাপকতা, প্রজননস্বাস্থ্য সমস্যা ও শিশুমৃত্যুর হার রীতিমতো অস্বাভাবিক। বিশেষ করে দুর্গম প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলে প্রসবকালীন মৃত্যু হার এখনো ব্যাপক।

---

[৫০] জাতীয় আদিবাসী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা হোক, মঙ্গল কুমার চাকমা, মাওরুম, (দীপায়ন খীসা সম্পাদিত), হিল রিসার্স অ্যান্ড প্রোটেকশন ফোরাম, ঢাকা, ২০০৮

গ্রামীণ ও হস্তশিল্পে আদিবাসী পাহাড়ি নারী

আদিবাসী পাহাড়ি সমাজে নারীরা স্বকীয় বর্ণবৈচিত্র্যমণ্ডিত অলংকারে, পোশাকে-আচ্ছাদনে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের মূর্ত প্রতীক। আবহমান ঐতিহ্যের ধারায় আদিবাসী পাহাড়ি নারীরা নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক। আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও পরিধেয় কাপড়চোপড় বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও ডিজাইনে আকর্ষণীয়। একপ্রকার কোমর তাঁতে পাহাড়ি নারীরা কাপড় তৈরি করে থাকে।

আদিবাসী সমাজে পোশাক-পরিচ্ছদ সংক্রান্ত বস্তুগত সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। তারা কাপড় বোনা ও ডিজাইন সংগ্রহ করার কাজ বংশপরম্পরায় ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষণ করে আসছে। নিজস্ব কাপড় পরিধান করে নিজস্ব ঐতিহ্যকে ধরে রাখছে। আদিবাসী পোশাক-পরিচ্ছদ বিশ্বের ফ্যাশন জগতে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। নারীরাই নিজস্ব পদ্ধতিতে মদ বানানো, বিভিন্ন সুস্বাদু আদিবাসী রান্নাসহ বিভিন্ন রকমের পিঠার সংস্কৃতি ধরে রেখেছে। আদিবাসী এই সুস্বাদু রান্নার পদ্ধতিগুলোও সংরক্ষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম বীজ সংগ্রহ নারীরাই করে থাকে।

আদিবাসী পাহাড়িরা বনের বাঁশ ও বেত দিয়ে সুন্দর সুন্দর বাঁশের ঝুড়ি তৈরিতে দক্ষ। তারা বাঁশসহ তাদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তৈরি করে থাকে। তবে তৈজসপত্র হিসেবে মৃৎশিল্পের হাঁড়ি, বাসন-কোসন ইত্যাদির প্রচলন আছে বলে জানা যায়। এক্ষেত্রে আদিবাসী নারীরা অনেকে দক্ষ।

আদিবাসী পাহাড়িদের ঐতিহ্যবাহী পেশার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী কোমর তাঁতে পোশাক-পরিচ্ছদ বুনন। আর আদিবাসী পাহাড়ি নারীরাই এই পেশার শ্রমজীবী। আগেকার দিনে মূলত নিজের ব্যবহারের জন্য এবং গুণবতী পাত্রী হিসেবে উপস্থাপনের জন্য এই ঐতিহ্যবাহী বুননশৈলী শিখতে হতো পাহাড়ি নারীদের। বাজার অর্থনীতির সাথে পরিচিত হবার ফলে এখন ব্যবসায়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যেও পাহাড়ি নারীরা আদিবাসী ঐতিহ্যবাহী পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি করে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাহাড়ি নারীরা ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। মধ্যস্বত্বভোগীরাই অধিকাংশ লভ্যাংশ আত্মসাৎ করে থাকে।[৫১]

ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প করপোরেশন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের হস্তান্তরিত প্রতিষ্ঠান। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের বয়নশিল্প ও বাঁশ-বেতের শিল্প বিকাশে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তবে পর্যাপ্ত অর্থ সংস্থানের অভাবে এবং বাজারজাতকরণের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবে এ পেশায় নিয়োজিত পাহাড়ি নারীরা আশানুরূপ সফলতা অর্জন করতে পারছে না বলে অনেকে অভিমত দিয়েছেন।

---

[৫১] Occupations and Economy in Transition: A Case Study of the Chittagong Hill Tracts, Raja Devasish Roy, Traditional Occupations of Indigenous and Tribal Peoples: Emerging Trends, Project to Promote ILO Policy on Indigenous and Tribal Peoples, ILO, 2000

প্রত্যাগত শরণার্থী পাহাড়ি নারীদের অবস্থা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি 'ঘ' খণ্ডের ১ নম্বর ধারা অনুযায়ী এবং সরকার ও শরণার্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ৯ মার্চ ১৯৯৭ তারিখে স্বাক্ষরিত ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি মোতাবেক ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ১২,২২২ পরিবারের ৬৪,৬০৯ জন পাহাড়ি শরণার্থী প্রত্যাবর্তন করে। টাস্কফোর্সের মাধ্যমে প্রত্যাগত শরণার্থীদের অধিকাংশকে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাদি দেয়া হয়েছে। প্রত্যাগত পাহাড়ি শরণার্থীরা এখনো সরকার থেকে রেশন (প্রতি সপ্তাহে প্রাপ্তবয়স্করা ৫ কেজি ও অপ্রাপ্তবয়স্করা ২.৫ কেজি চাল) পেয়ে থাকে।

অপরদিকে প্রত্যাগত শরণার্থীদের জমি ও ভিটেমাটি ফেরত দেয়া হয়নি। সরকার ও শরণার্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে স্বাক্ষরিত ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তির ১১ নম্বর ধারা অনুসারে প্রত্যাবর্তনকারী শরণার্থীদের মালিকানাধীন জমি তাদের নিকট প্রত্যার্পণ করার বিধান রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির তথ্যানুসারে প্রত্যাগত পাহাড়ি শরণার্থীদের মধ্যে ৯,৭৮০ পরিবার তাদের ধান্যজমি, বাগান-বাগিচা ও বাস্তুভিটা ফেরত পায়নি। তাদের জায়গা জমি ও ৪০টি গ্রাম এখনো বসতি স্থাপনকারীদের দখলে থাকায় তাদের পুনর্বাসন এখনো যথাযথভাবে হয়নি। প্রত্যাগত ৮৯০ পরিবার হালের গরুর টাকা পায়নি।

নিজ জায়গা-জমি ফেরত না পাওয়ায় প্রত্যাগত পাহাড়ি শরণার্থীদের অনেকে মানবেতর জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। বিশেষ করে অনেকক্ষেত্রে প্রত্যাগত নারী শরণার্থীরা নানা হয়রানির শিকার হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে দীঘিনালা মডেল প্রাইমারি স্কুলে স্থাপিত ট্রান্সজিট ক্যাম্পে অবস্থানকারী ২৬টি প্রত্যাগত শরণার্থী পরিবারের সমস্যার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাদের জায়গা-জমির ওপর বোয়ালখালী নতুন বাজার স্থাপনের ফলে এখনো তারা তাদের জায়গা-জমি ফেরত পায়নি। কিন্তু তাদের জায়গা-জমি ফেরত দানের কোনো উদ্যোগ না নিয়ে সরকার ১৯৯৯ সালের ২০ আগস্ট তাদেরকে ট্রান্সজিট ক্যাম্প থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদের জন্য স্বপন চন্দ্র পাল নামে এক ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পুলিশ ও বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের গড়া ভিডিপি সদস্যদের লেলিয়ে দেয়। এসময় কেবল নারী ও শিশুরা ক্যাম্পে ছিল। কিন্তু পুলিশ ও ভিডিপি সদস্যরা কোনো বাছবিচার না করে নারী ও শিশুদের ওপর এলোপাথাড়ি লাঠিপেটা করে। এতে ৬ মাসের একজন শিশু ও ১০ জন নারীসহ ১২ জন প্রত্যাগত শরণার্থী আহত হয়। সর্বশেষ ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০০৭ সালে তাদেরকে ট্রান্সজিট ক্যাম্প থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে অন্যত্র পুনর্বাসিত করা হয়। তারা এখনো তাদের জমি ও বসতভিটা ফেরত পায়নি।

সরকার পক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, প্রত্যাগত পাহাড়ি শরণার্থীদের এলাকা থেকে বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের অন্যত্র সরিয়ে নেবে। কিন্তু সরকার তা পালন করেনি। ফলে বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের সাথে প্রত্যাগত পাহাড়ি শরণার্থীদের মধ্যে প্রায়ই নানা বিরোধ ও সমস্যার উদ্ভব হয়। বিশেষ করে নারী শরণার্থী ও তাদের মেয়েশিশুরা বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের সহিংসতার শিকার হয়। উদাহরণ হিসেবে ১৯৯৯ সালের ২১ জানুয়ারি খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলার মেরুং ইউনিয়নের বেতছড়ি বিভূতি ভূষণ কার্বারী পাড়ায় প্রত্যাগত শরণাথী নারী পূর্ণশোভা চাকমার ওপর বসতি

স্থাপনকারী বাঙালিদের হামলার ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ওইদিন পূর্ণশোভা চাকমা তাদের জমিতে কাজ করতে গেলে ইউনুস নামে একজন বসতি স্থাপনকারী বাঙালি ধারালো দা দিয়ে হামলা করে। পার্শ্ববর্তী জমিতে কর্মরত পাহাড়িরা পূর্ণশোভা চাকমার চিৎকার শুনে তাকে উদ্ধার করে। উক্ত ইউনুস দীর্ঘদিন ধরে পূর্ণশোভাদের জমি জবরদখল করার চেষ্টা করে আসছিল। ২০০৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলার ছোট মেরুং এলাকার প্রত্যাগত শরণার্থী জ্ঞানজ্যোতি চাকমার মেয়ে স্কুলছাত্রী রুনা চাকমা (১৫) স্কুলে গেলে বসতি স্থাপনকারী বাঙালিরা ধর্ষণ করে হত্যা করে।

অভ্যন্তরীণ পাহাড়ি উদ্বাস্তু নারীদের অবস্থা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি 'ঘ' খণ্ডের ১ ও ২ নম্বর ধারায় তিন পার্বত্য জেলার অভ্যন্তরীণ পাহাড়ি (উপজাতীয়) উদ্বাস্তুদের পরিচিহ্নিত করে টাস্কফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধান রয়েছে। প্রত্যাগত শরণার্থীসহ অভ্যন্তরীণ পাহাড়ি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য টাস্কফোর্স গঠিত হয় এবং টাস্কফোর্স সভায় 'পার্বত্য চট্টগ্রামে (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবন) দীর্ঘ সময় ধরে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিজনিত কারণে যে সকল উপজাতি নিজ গ্রাম, মৌজা, অঞ্চল ত্যাগ করে দেশের ভিতরেই অন্যত্র চলে গেছেন বা চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন, তারা অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে বিবেচিত হবেন' মর্মে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুর সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়।[৫২]

কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের ১২ বছর অতিক্রান্ত হলেও অভ্যন্তরীণ পাহাড়ি (উপজাতীয়) উদ্বাস্তুদের এখনো পুনর্বাসন করা হয়নি। অধিকন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে কেবল অভ্যন্তরীণ পাহাড়ি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কথা উল্লেখ থাকলেও সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বসতি স্থাপন করতে দেয়া বাঙালিদেরও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদেরও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রাম পুনর্বাসনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগ কর্তৃক ১৯-০৭-১৯৯৮ তারিখে টাস্কফোর্সের কাছে পত্র প্রেরণ করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী এই উদ্যোগের প্রতিবাদে জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিদ্বয় ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত নবম সভা চলাকালে ওয়াকআউট করেন। পরবর্তীকালে জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে ২০০০ সালের ১৫ মে অনুষ্ঠিত টাস্কফোর্সের একাদশ সভায় একতরফাভাবে ৯০,২০৮ পাহাড়ি পরিবার এবং ৩৮,১৫৬ বসতি স্থাপনকারী পরিবারকে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে ঘোষণা করা হয়। অবশেষে বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের সরকারি উদ্যোগের বিরুদ্ধে পার্বত্যবাসীর প্রতিবাদের মুখে টাস্কফোর্সের কার্যক্রম প্রায় অচল হয়ে পড়ে।

বর্তমানে অভ্যন্তরীণ পাহাড়ি উদ্বাস্তুরা অধিকাংশই সংরক্ষিত বনাঞ্চল, পাহাড়িদের প্রথাগতভাবে পরিচালিত জুমভূমি ও মৌজা ভূমি, আত্মীয়স্বজনের ভিটেমাটি ইত্যাদি জায়গা-জমিতে বসবাস করছে।

---

[৫২] ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স এর ২৭ জুন ১৯৯৮ খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সভার কার্যবিবরণী।

অনেকে ভাসমান অবস্থায় দিনমজুরি, কৃষিশ্রম বিক্রি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়, এমনকি চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ইপিজেডসহ বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে স্বল্প বেতনে নিম্নশ্রেণির চাকুরি করে জীবন নির্বাহ করছে। সংরক্ষিত বনাঞ্চল, পাহাড়িদের প্রথাগতভাবে পরিচালিত জুমভূমি ও মৌজা ভূমিতে বসবাসকারী পাহাড়ি অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুরা বনবিভাগের ফরেস্ট ভিলেজার হিসেবে দিনমজুরি এবং পাশাপাশি জুমচাষ করে মানবেতর জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। সংরক্ষিত বনাঞ্চলের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় নেই কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও সরকারি সেবা সুবিধাদি। ফলে তারা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা থেকে পুরোপুরিই বঞ্চিত।[৫৩] তারা ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া, হেপাটাইটিস ও এনিমিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। কিন্তু চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা নেই। এসব গহিন অরণ্যে ম্যালেরিয়া প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে বঞ্চনার শিকার হয় পাহাড়ি নারী ও মেয়েশিশুরা। মুষ্টিমেয় কিছু উদ্বাস্তু পরিবার উপজেলা বা জেলা সদরে পাঠিয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হলেও নিরাপত্তাহীনতা ও সামাজিক কারণে মেয়েশিশুরা সেই সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়। অধিকন্তু প্রত্যাগত পাহাড়ি শরণার্থীরা সরকার থেকে রেশন পেলেও অভ্যন্তরীণ পাহাড়ি উদ্বাস্তুরা কোনো রেশন পায় না।[৫৪] কতিপয় স্থানীয় এনজিও এসব পাহাড়ি উদ্বাস্তুদের শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্প নেয়ার উদ্যোগ নিলেও তা অত্যন্ত অপ্রতুল ও সাময়িক।

এসব অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু প্রতিনিয়ত বনবিভাগ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হয়রানির শিকার হয়। ফরেস্ট ভিলেজার হিসেবে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের কাজের সুযোগ ও মজুরি নির্ভর করে বনবিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর। ফলে তাদের অনাহারে অর্ধাহারে জীবন কাটাতে হয়। উপরন্তু প্রায় সময় বনবিভাগ, বিডিআর ও সেনাবাহিনী অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের জুমের ওপর হামলা চালিয়ে থাকে। জুমচাষকে অবৈধ ঘোষণা করে তাদের জুমঘর ভেঙে দেয় এবং জুমক্ষেত তছনছ করে দেয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ২০০০ সালের ৩০ জানুয়ারি বনবিভাগ রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া এলাকায় জুমচাষীদের এক ডজনের অধিক জুমঘর ভেঙে দেয়। ২০০৫ সালের ২৩ জুন রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেকের নিউ লঙ্কর ও ওল্ড লঙ্কর এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিডিআর সদস্যরা ২০টি জুমঘর সম্পূর্ণভাবে গুঁড়িয়ে দেয়। সম্প্রতি ২০ এপ্রিল ২০০৮ সাজেকের বাঘাইছড়ি এলাকায় হামলায় বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের লেলিয়ে দিয়ে ৭টি পাহাড়ি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

---

[৫৩] Internally displaced in CHT continue to suffer, New Age, Dhaka, Thursday, 14 February 2008

[৫৪] BANGLADESH: Indigenous people and religious minorities still affected by displacement, International Displacement Monitoring Centre (IDMC) and Norwegian Refugee Council (NRC), Geneva, Switzerland, 16 July 2009; Web: www.internal-displacement.org

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-উত্তর পরিস্থিতি ও নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা

পারিবারিক সহিংসতা

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণ যুগ যুগ ধরে সামন্ততান্ত্রিক শাসন শোষণে নিষ্পেষিত হয়ে আসছে। এই সামন্ত শাসকগোষ্ঠী পাহাড়ি জনগণের জাতীয় বিকাশ ও স্বার্থের দিকে কোনোদিন মনোযোগ দেয়নি। তাই পাহাড়ি সমাজে নারীর স্থান একেবারে নিকৃষ্ট পর্যায়ের ভাবা হয়। পুরুষের ভোগ্যবস্তু, সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ও পারিবারিক দাসী ছাড়া নারীদের আর অন্য কিছু ভাবা হয় না। আতুর ঘর, রান্নাঘর ও শয়ন ঘর— এই তিন কামরার গণ্ডিবদ্ধ খাঁচায় তাদের সারাজীবন তিলে তিলে ক্ষয় হতে হয়। ঘরকন্নার কাজ যতই পরিশ্রমের হোক না কেন পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় তার কানাকড়িও মূল্য দেয়া হয় না।

পাশাপাশি পুরুষের সাথে তাদেরকে উৎপাদনের কাজেও অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু উৎপাদন শক্তির ওপর নারীর অধিকার সমাজে স্বীকৃত হয় না। নারীদের বিন্দুমাত্র অধিকার প্রদান সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বরদাস্ত করে না। অধিকন্তু সামান্য পদস্খলনে তাদের ওপর নেমে আসে অমানুষিক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, যার মাত্রা মৃত্যু পর্যন্ত গড়াতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-উত্তরকালে আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের ওপর এই সহিংসতা নির্মূলীকরণে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হলেও এখনো নানারূপে বিভিন্ন মাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে।

বিশ্বায়নের প্রবল আগ্রাসনে বাজার অর্থনীতি ও পুঁজিবাদী প্রভাব পাহাড়ি সমাজে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। পুঁজিবাদী সমাজে নারী স্বাধীনতার প্রভাবে আদিবাসী পাহাড়ি নারীসমাজের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের কিছু কিছু সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠার পর আদিবাসী সমাজে নানা অর্থনৈতিক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে এবং তাতে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আদিবাসী পাহাড়ি সমাজে এখনো ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল অবশেষ ও ধারণাগুলো পাহাড়ি নারীসমাজকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করে চলেছে।

সামাজিক সহিংসতা

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রেই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়ি নারীরা বৈষম্যের শিকার। সমাজ ও রাষ্ট্রের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসাসহ সকল নাগরিক সুবিধা দেবার ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য করা হয়। অব্যাহত এই বৈষম্যের কারণে সামাজিক ক্ষেত্রে আদিবাসী পাহাড়ি নারীরা সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে আছে। অবস্থান ও ভিন্নতার কারণে বাঙালি নারীর তুলনায় পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়ি নারীরা আরো বেশি বৈষম্যের শিকার হন। বাঙালি নারীদের মতো আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের সামাজিক বিধিনিষেধের বেড়াজালে বন্দি থাকতে হয় না

বটে, তবে তারা বৈষম্যহীন জীবনযাপন করে এই ধারণাটি নিরঙ্কুশ সত্য নয়। নারীরা পুরুষের তুলনায় পরিশ্রম বেশি করলেও অনেক আদিবাসী পাহাড়ি সমাজে নারীর মর্যাদা পুরুষের তুলনায় কম।[৫৫]

সচরাচর আদিবাসী পাহাড়ি সমাজে নারীর ওপর সহিংসতার মাত্রা কম। যৌতুকের কারণে নির্যাতন, অ্যাসিড নিক্ষেপ, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদি আদিবাসী পাহাড়ি সমাজে তেমন একটা দেখা যায় না। তারপরও নানাভাবে নানামাত্রায় আদিবাসী পাহাড়ি নারীর ওপর সহিংসতা বিদ্যমান। নারীকে গালিগালাজ, কখনো কখনো মারধর, পরিশ্রমের বোঝা চাপিয়ে দেয়া ইত্যাদি নিপীড়ন অনেক আদিবাসী পাহাড়ি নারীকে ভোগ করতে হয়। এ জাতীয় নির্যাতনের ঘটনা সাধারণত অভাব অনটনের পরিবার ও মদ্যপ মাতাল স্বামীর ঘরে বেশি ঘটতে দেখা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে 'উপজাতীয় রীতিনীতি অনুসারে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উপজাতীয় বিষয়ক বিরোধের বিচার' বিষয়টি তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ [চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩৪ (গ) ধারা][৫৬] ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের অধীন [চুক্তির 'গ' খণ্ডের ৯ (ঙ) ধারা]। এই ধারা বলে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আদিবাসী পাহাড়ি সমাজে নারীর ওপর পারিবারিক ও সামাজিক সহিংসতা প্রতিরোধ এবং সচেতনতা সংক্রান্ত উদ্বুদ্ধকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু বর্তমান অন্তর্বর্তী তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ এ বিষয়ে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করেনি। এর পেছনে অন্যতম মৌলিক কারণ হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ পরিষদ গঠিত না হওয়া এবং বর্তমানে বিদ্যমান অন্তর্বর্তী পরিষদে নারীর প্রতিনিধিত্ব না থাকা। বর্তমানে দলীয় মনোনয়নের মাধ্যমে ৫ সদস্যসম্বলিত অন্তর্বর্তী পার্বত্য জেলা পরিষদ বলবৎ রয়েছে। এ পরিষদগুলোর মধ্যে জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার তেমন কোনো উদ্যোগ বা আগ্রহ দেয়া যায় না। জাতীয় সরকারের মনোনীত বিধায় জনগণের চেয়ে ঢাকাস্থ কর্তৃপক্ষ-মুখাপেক্ষিতা এবং জনস্বার্থের চেয়ে নিজের স্বার্থের প্রতি প্রাধান্য দেয়ার ঝোঁক তাদের মধ্যে প্রবলভাবে লক্ষ করা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকেও আইন অনুসারে ক্ষমতায়িত করা হয়নি। ফলে আঞ্চলিক পরিষদও আদিবাসী সমাজের পারিবারিক ও সামাজিক সহিংসতা প্রতিরোধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

সাম্প্রদায়িক সহিংসতা

প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীল সামন্ততান্ত্রিক শাসন-শোষণের পাশাপাশি সমান্তরালভাবে পাহাড়ি জনগণের ওপর যুগ যুগ ধরে চলে আসছে নির্মম বিজাতীয় শাসন-শোষণ। ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ— এই সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শাসকগোষ্ঠীর হাতে পাহাড়ি জনগণের ভাগ্যের

[৫৫] সকল প্রকার বৈষম্য থেকে আদিবাসী নারীদের রক্ষা করতে হবে, দিলারা রেখা, জুম পাহাড়ের জীবন, (মঙ্গল কুমার চাকমা, সোহরাব হাসান ও আবদুল আওয়াল সম্পাদিত), গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ঢাকা, মে ২০০৮

[৫৬] পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে ১৯৯৮ সনের ৯, ১০ ও ১১ নম্বর আইন দ্বারা যথাক্রমে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে সন্নিবেশ করা হয়।

চাবিকাঠি পর্যায়ক্রমে পালাবদল হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীর ওপর জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক নিপীড়ন জেঁকে বসতে থাকে। স্বাধীনতার পর সত্তর দশক থেকে নানা অজুহাতে ব্যাপকভাবে সেনাবাহিনী মোতায়েন শুরু হয়। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বাঙালি অভ্যন্তরীণ অভিবাসন (১৯৭৯-১৯৮৪) শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জনগণকে স্থানচ্যুতই করেনি, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাদের জন্য নিরাপত্তা সমস্যাও সৃষ্টি করেছে।[৫৭] এমতাবস্থায় পাহাড়ি জনগণের ওপর শুরু হয় অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা, জেলজুলুম, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি নিপীড়ন। এই নিপীড়নের অন্যতম শিকার হলো পাহাড়ি নারীসমাজ। পাহাড়ি নারীদের ওপর চলতে থাকে অমানুষিক অত্যাচার, ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, পথে-ঘাটে ও অফিস আদালতে শালীনতাহানি, অপহরণ প্রভৃতি মানবতাবর্জিত জঘন্য কার্যকলাপ।

এমনিতর পরিস্থিতিতে বৃহত্তর বাঙালি নারীসমাজের তুলনায় আদিবাসী নারীরা দ্বিগুণ বঞ্চনার শিকার। তারা আদিবাসী হিসেবে সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিগত নিপীড়নের শিকার আর নারী হিসেবে আদিবাসী সমাজে পিতৃতান্ত্রিক শাসন-শোষণে নির্মমভাবে নিষ্পেষিত। অথচ সকল ক্ষেত্রে সেই দ্বিগুণ শোষণ-বঞ্চনায় নিষ্পেষিত আদিবাসী নারীসমাজের কথা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে।

সকল ক্ষেত্রে আদিবাসী পাহাড়ি নারীর নিরাপত্তাহীনতা একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-উত্তর সময়েও কর্মক্ষেত্রে অআদিবাসী সহকর্মী কর্তৃক লাঞ্ছনা ও এলাকায় চলাফেরার ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তাহীনতার কোনো উন্নয়ন ঘটেনি। বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর একটি উগ্র জাতীয়তাবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক সহিংসতার অন্যতম শিকার হচ্ছে আদিবাসী পাহাড়ি নারীরা। বিশেষ করে তারা উগ্র জাতীয়তাবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী কর্তৃক ধর্ষণ, অপহরণ, হত্যা, জোরপূর্বক বিবাহ ও ধর্মান্তরকরণ ইত্যাদি সন্ত্রাসের শিকার হয়ে আসছে। এক্ষেত্রে ১৯৯৬ সালে ১২ জুন রাতের আঁধারে কল্পনা চাকমাকে সন্দেহভাজন লে. ফেরদৌস গং কর্তৃক অপহরণের ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাটি একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ১ নম্বর ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের সরিয়ে নেয়ার সরাসরি বিধান না থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে চুক্তিতে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ধারা/বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে—

- অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দার সংজ্ঞা নির্ধারণ;
- কেবল স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়ন;
- সার্কেল চিফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান;

[৫৭] Challenges for Judicial Pluralism and Customary Laws of Indigenous Peoples: the Case of the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh by Raja Devasish Roy, Arizona Journal of International and Comparative Law, 2004

- পার্বত্য জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতীত ভূমি বন্দোবস্ত, হস্তান্তর, ইজারা, অধিগ্রহণে বিধিনিষেধ;
- পার্বত্যাঞ্চলের চাকুরিতে পাহাড়িদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করা;
- পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্ম-মৃত্যু পরিসংখ্যান সংরক্ষণ;
- ভূমি কমিশনের মাধ্যমে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি এবং বসতি স্থাপনকারী বাঙালি কর্তৃক জবরদখলকৃত পাহাড়িদের ভূমি ফেরতদানের ব্যবস্থা করা।

এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলিকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেয়া এবং এই লক্ষ্যে সময়-সীমা নির্ধারণ করার বিধান করা হয়েছে। চুক্তির এই বিধান এখনো সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন হয়নি। জনসংহতি সমিতির মতে, পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিগত ১২ বছরে পাঁচ শতাধিক ক্যাম্পের মধ্যে মাত্র ৩১টি ক্যাম্প প্রত্যাহারের চিঠি তাদের হস্তগত হয়েছে। পক্ষান্তরে সরকারের মতে, কখনো ৭১টি ক্যাম্প, কখনো ১৭২টি এবং অতি সম্প্রতি ২০০টি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে।

নারী অধিকার কর্মীদের মতে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-উত্তরকালেও পাহাড়ি নারীসমাজের ওপর জাতিগত নিপীড়ন ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রধান কারণ হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়া। এর অন্যতম হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অধ্যুষিত এলাকার বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সরকারের কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করা। পক্ষান্তরে সরকারের একটি বিশেষ গোষ্ঠী কর্তৃক বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের পুনর্বাসন; বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ; ভূমি জবরদখলে বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদেরকে মদদ দান; রোহিঙ্গা শরণার্থীসহ বহিরাগতদের পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তকরণ; পার্বত্য চুক্তিকে লঙ্ঘন করে বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য করে টাস্কফোর্স কর্তৃক পুনর্বাসনের উদ্যোগ, জেলা প্রশাসক কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান; চাকুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান; বহিরাগতদের নিকট ভূমি বন্দোবস্তী ও ইজারা প্রদান ইত্যাদি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়।

দ্বিতীয় কারণ হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা, আনসার, এপিবি ও ভিডিপি'র অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার না করা এবং বিগত ১২ বছরেও ক্যাম্প প্রত্যাহারের পূর্ণাঙ্গ সময়সীমা নির্ধারণ না করা। উপরন্তু চুক্তি-উত্তরকালে ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে ৫ সেনাবাহিনীর হাতে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। উক্ত ক্ষমতার বদৌলতে আনসার, এপিবি ও ভিডিপিসহ সেনা সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধে সামরিক অভিযান চালাতে পারে, যা পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম কারণ বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেন।

এছাড়া বসতি স্থাপনকারী বাঙালিরাও পাহাড়িদের জায়গা-জমি বেদখলের উদ্দেশ্যে নারী ধর্ষণ, অপহরণ, হত্যাসহ সাম্প্রদায়িক সহিংসতা অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে। সন্ত্রাসের টার্গেট হিসেবে পূর্বের মতোই পাহাড়ি নারীদের ওপর চড়াও হচ্ছে। পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক বসতি স্থাপনকারী বাঙালি কর্তৃক বেদখলকৃত পাহাড়িদের জায়গা-জমি ফেরত দানের লক্ষ্যে ভূমি কমিশন গঠনের মাধ্যমে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না করা, গুচ্ছগ্রাম ভেঙে না দেয়া, বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের রেশন বন্ধ না করা, পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ না করা, কেবল সার্কেল চিফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা চালু না করা (আইন লঙ্ঘন করে জেলা প্রশাসককেও সনদপত্র প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যাতে বসতি স্থাপনকারী বাঙালিরাসহ বহিরাগতরা স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র পাচ্ছে), কেবল স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়ন না করা ইত্যাদি কারণে বসতি স্থাপনকারী বাঙালিরা পাহাড়িদের ভূমি জবরদখল, সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো, পাহাড়িদের অপহরণ, হত্যা ও গুম করা, আদিবাসী পাহাড়ি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া ইত্যাদি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সংঘটিত করতে সাহস পাচ্ছে। আর বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের এসব সন্ত্রাসী কাজের প্রধান শিকার হচ্ছে পাহাড়ি নারী, শিশু ও বৃদ্ধরা।[৫৮]

অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণির কর্মচারী পদে পাহাড়িদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগের প্রক্রিয়া যথাযথভাবে কার্যকর না হওয়ার কারণে পার্বত্য চুক্তি-উত্তরকালেও সাধারণ প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা ও উপজেলা প্রশাসনে বহিরাগত উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আধিপত্য অব্যাহত রয়েছে। পাহাড়ি নারীদের ওপর ধর্ষণ, পাহাড়ি নারী অপহরণ, জোরপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণসহ সহিংস কার্যকলাপ পরিচালনার ক্ষেত্রে এসব পাহাড়িবিদ্বেষী বহিরাগত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সহায়তা দিয়ে চলেছে।

তাই পার্বত্য চুক্তির উল্লিখিত বিষয়সমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের ওপরই জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা থেকে পাহাড়ি নারীদের মুক্তির বিষয়টি নিহিত রয়েছে। পার্বত্য চুক্তির উল্লিখিত বিষয়সমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে সেনা শাসন ও বসতি স্থাপনকারী বাঙালি কর্তৃক উদ্ভূত সমস্যা এবং নারী ধর্ষণসহ সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসে উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীকে আদিবাসী বিদ্বেষী বহিরাগত বাঙালি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দ্বারা প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান ইত্যাদির অবসান হতে বাধ্য। আর তখনই পাহাড়ি নারীসমাজ জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক নিপীড়নের নৃশংস হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সত্ত্বেও সেখানে আদিবাসী নারীরা বাঙালি বসতি স্থাপনকারী ও বাঙালি নিরাপত্তা কর্মীদের দ্বারা মৌখিক গঞ্জনা ও যৌন হয়রানির শিকার। সংঘাতের অবসান এ ধরনের যৌন হয়রানির

[৫৮] সামাজিক ও জাতিগত নিপীড়ন থেকে জুম্ম নারীসমাজের প্রকৃত মুক্তি কোন পথে?, মঙ্গল কুমার চাকমা, নারী ও প্রগতি, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০০৫, রোকেয়া কবীর সম্পাদিত, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা

ঝুঁকি খানিকটা হ্রাস করলেও আদিবাসী নারীরা এখনো খুবই বিপন্ন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-উত্তরকালে (১৯৯৮-২০০৮) সাম্প্রদায়িক সংহিংসতার শিকার হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে কমপক্ষে ৫১ জন পাহাড়ি নারী ধর্ষণের শিকার হয়। যৌন হয়রানির শিকার হয় অন্তত ২০ জন পাহাড়ি নারী। অধিকাংশ ধর্ষণ বা যৌন হয়রানির ঘটনা সামাজিক ও পারিবারিক মনোভাব নারী সহায়ক না হওয়ার কারণে অজ্ঞাতই থেকে যায়। এছাড়া অনেক নারী নানা হয়রানিমূলক মামলা, হত্যা, অপহরণ, অপরহণের পর জোরপূর্বক বিয়ে ইত্যাদি মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়। এসব তথ্যই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-উত্তর সময়ে আদিবাসী নারীর সার্বিক অবস্থার করুণ চিত্রকে ফুটিয়ে তোলে।

সাধারণত যৌন সহিংসতার শিকার হয়েও যারা বেঁচে থাকে, তারা কেবল এর শারীরিক প্রতিক্রিয়াই ভোগ করে না, মানসিকভাবেও থাকে ভীত-সন্ত্রস্ত। কতিপয় বিরল ঘটনায় যখন কোনো ধর্ষিতা নারী সাহস করে মুখ খোলে এবং সামরিক/আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য বা পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে, তখন তারা হুমকির মুখে পড়ে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অভিযুক্ত অপরাধীরা কোনো শাস্তি ভোগ করে না এবং অপরাধ সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপনকারী আরো হয়রানির শিকার হয়।

আদিবাসী পাহাড়ি নারীর ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি গুরুত্ব না পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্যের মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হতে পারে রাজনৈতিক দলগুলোতে এবং স্থানীয় জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদগুলোতে আদিবাসী নারীদের প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত কম থাকা এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকা।

সুবিচার ও আইনি সহায়তা

পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আইনগতভাবে দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারকার্যের ভার ছিল জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ওপর। এই বিচারিক এখতিয়ারগুলো আইন, বিচার ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিচারিক কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করার জন্য 'পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের ৩৮ নম্বর আইন)' প্রণয়ন করা হয়। এই আইনে সংশ্লিষ্ট জেলার আইন, প্রথা ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধীয় বিষয়গুলো বিচার করতে এই আদালতগুলো বাধ্য থাকবে এবং আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত আইন ছাড়াও, প্রথাগত আইন ও রীতিনীতির পরিষ্কার ও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি রয়েছে।[৫৯]

প্রথাগত রাজা ও হেডম্যানগণ পাহাড়িদের প্রথাগত আইনে যে বিচারকার্য সম্পন্ন করে থাকেন তা এই '২০০৩ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন (সংশোধন) আইনে'র মাধ্যমে প্রভাব পড়বে না। এসব আদালতের যে এখতিয়ার রয়েছে সেখান থেকে পাহাড়িদের প্রথাগত বিচার ব্যবস্থাকে স্পষ্টভাবে বাদ দেয়া হয়েছে (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার পারিবারিক আইন ও অন্যান্য প্রথাগত আইনের মামলা, যেগুলো রাজা ও হেডম্যানদের দ্বারা বিচার করা যাবে সেগুলো ব্যতীত)।

[৫৯] The ILO Convention on Indigenous and Tribal Populations, 1957 and the Laws of Bangladesh: A Comparative Review, Raja Devasish Roy, PRO 169, International Labour Standards Department, ILO Geneva and ILO Office, Dhaka, 2009

পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ অনুসারে ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ১ জুলাই ২০০৮ সালে পার্বত্য তিন জেলায় জজ আদালত কার্যকর হয়। এটা সারাদেশে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণেরও একটা ফসল বলা যায়। এসব আদালতে আদিবাসীদের মামলাগুলো আদিবাসী প্রথাগত আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি করারও বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। আর এর পাশাপাশি আগের মতোই ঐতিহ্যবাহী বিচার ব্যবস্থা বলবৎ রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন কার্যকর করতে হাইকোর্ট তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি পৃথক আদালত গঠনের নির্দেশ দেয়। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী নির্যাতন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা লাভ করে। অন্যান্য জেলার মতো পৃথক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত স্থাপিত না হলেও নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত মামলাগুলোর বিচারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তিন পার্বত্য জেলার সেসন জজের ওপর। তারা নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত মামলাগুলোর বিচারের ক্ষেত্রে স্পেশাল ট্রাইবুনাল জজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তিন পার্বত্য জেলায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত স্থাপিত হলেও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সংক্রান্ত ঘটনাবলির ক্ষেত্রে মৌলিক কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা, প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতা, আদিবাসী পাহাড়িদের মামলা পরিচালনার মতো অর্থনৈতিক অবস্থা না থাকা, পর্যাপ্ত আইনি সহায়তার অভাব, বৈষম্যমূলক সামাজিক ধারণা ইত্যাদির ফলে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত থেকে আদিবাসী পাহাড়ি নারীরা আশানুরূপভাবে প্রত্যক্ষ সুফল পাচ্ছে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-উত্তরকালেও আদিবাসী নারীসহ পাহাড়িদের সুবিচার ও ন্যায্যতা নিশ্চিত হয়নি। এর অন্যতম কারণ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ শাসনব্যবস্থা কার্যকর না হওয়া এবং আদিবাসী পাহাড়িদের অগ্রাধিকার দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়ে স্থানীয় প্রশাসন গড়ে না ওঠা। এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারী বাইরে থাকেন। তাঁরা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সংস্কৃতি, সমাজ ও অধিকার বিষয়ে তেমন সংবেদনশীল নন এবং অনেকটা সাম্প্রদায়িক। ফলে দেখা যায় যে, পাহাড়ি নারীদের ওপর সংঘটিত অনেক ঘটনার মামলা করতে গেলে পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসন অনুকূল ভূমিকা পালন করে না।

উদাহরণ হিসেবে ২০০৬ সালের ৩রা এপ্রিল খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ির সাউপ্রু কার্বারী পাড়ায় বহিরাগত বসতি স্থাপনকারীদের হামলায় দু'জন মারমা আদিবাসী তরুণীর গণধর্ষণের ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। হাসপাতালে সেদিন কী বীভৎস অবস্থা! কারোর মাথায় দায়ের কোপের দাগ, কারোর পায়ে, হাতে কিংবা পিঠে বিভিন্ন জখমের চিহ্ন। অন্যান্য আহতদের সাথে সেদিন ধর্ষিত দু'জন তরুণীও হাসপাতালে এসে ভর্তি হয়। ভর্তি হওয়ার সাথে সাথে শুরু হয় বিভিন্ন মহলের অপতৎপরতা। ডাক্তাররা পরীক্ষা করতে চান না। মামলা করতে হবে, থানা থেকে পরীক্ষার জন্য লিখিত নির্দেশ আসতে হবে, এই-সেই নানারকমের টালবাহানা।

এরপর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩-এর ৩২ ধারা ফটোকপি করে ডাক্তারদের সরবরাহ করতে হলো, যাতে বলা হয়েছে যে, এই আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধের

শিকার ব্যক্তিকে কোনো হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য উপস্থিত করা হলে, উক্ত হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তার ডাক্তারি পরীক্ষা অতি দ্রুত সম্পন্ন করবেন এবং উক্ত ডাক্তারি পরীক্ষা সংক্রান্ত একটি সার্টিফিকেট সংশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করবেন এবং এরূপ অপরাধ সংঘটনের বিষয়টি স্থানীয় থানাকে অবহিত করবেন। এতে উল্লেখ আছে যে, যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন না হওয়ার জন্য সংশিষ্ট চিকিৎসকই দায়ী, তা দায়ী ব্যক্তির অদক্ষতা ও অসদাচরণ বলে বিবেচিত হবে।

উক্ত আইন সরবরাহ করার পর আবার সিভিল সার্জনের কাছে যাওয়া হয়। তখন সন্ধ্যা ৭টা। তখন তিনি আর দরজা খোলেন না, ফোন করলে বাসা থেকে বলে দেয়া হয় তিনি বাসায় নেই। নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে পরের দিন সিভিল সার্জন, আরএমও, দু'জন ডাক্তার এবং একজন সিনিয়র নার্সকে নিয়ে মেডিকেল বোর্ড গঠন করেন। ততক্ষণে ৪৮ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। এরপর ৫ এপ্রিল ২০০৬ বিকেল প্রায় ২:৩০ মিনিটের দিকে ঘটনার শিকার দুজনকে পরীক্ষা করার জন্য পরীক্ষাগারে ঢোকানো হয়। তারপর আবার শুরু হয় বিভিন্ন সংস্থার তৎপরতা। মনে হয় যেন যুদ্ধ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে পরীক্ষা সম্পন্ন হলো।[৬০] এরপর রিপোর্টের কপি পাওয়ার জন্য ডাক্তারদের আরো নানা তালবাহানা। অথচ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩-এ রিপোর্টের কপি কেবল ভিকটিম অথবা তার অভিভাবকদের দেওয়ার বিধান রয়েছে। এরপর ওপর মহল, বিশেষ বাহিনী, ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের টেলিফোন আর চাপ তো রয়েছেই।

অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ মামলা নিতেও অস্বীকার করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুলিশ মামলা নিলেও মামলার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় না। এমনকি অনেক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করলেও পুলিশের দুর্বল অভিযোগ গঠনের কারণে ছাড়া পেয়ে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর আদিবাসী পাহাড়ি নারীর ওপর সংঘটিত যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, হত্যা ও অপহরণের বিরুদ্ধে যতগুলো মামলা হয়েছে, তার কোনোটিতেই আজ পর্যন্ত দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবার রেকর্ড স্থাপিত হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরাধীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে যায় এবং সহিংসতার শিকার আদিবাসী পাহাড়ি নারীরা ন্যায় ও সুবিচার থেকে বরাবরই বঞ্চিত হয়। এতে করে অপরাধীরা প্রকারান্তরে আরো উৎসাহিত হয় বলে আদিবাসী নারী অধিকার কর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

২০০৩ সালের ২৬ আগস্ট সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলায় বসতি স্থাপনকারী বাঙালিরা ১৪টি পাহাড়ি গ্রাম সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দেয় এবং এতে ১০ জন পাহাড়ি নারী গণধর্ষণের শিকার হয় বলে অভিযোগ ওঠে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রতিনিধিদলসহ জাতীয় পর্যায়ের অনেক মানবাধিকার সংস্থার প্রতিনিধিদল ঘটনার তদন্ত করে। কিন্তু ধর্ষণের ঘটনা বরাবরই অন্তরালে থেকে যায়। বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি উঠলেও সরকার সদম্ভে তা অস্বীকার করে চলে।

ড. ফখরুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০০৮ অনুসারে ১৮ নভেম্বর ২০০৮ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের তিন সদস্যের অন্যতম ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আদিবাসী পাহাড়ি শিক্ষক। মানবাধিকার

[৬০] মানবিকতার ছেঁড়া স্বপ্নের জামা : সমকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসংগ, হেমন্ত ত্রিপুরা, জুম্ম সংবাদ বুলেটিন, আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস সংখ্যা, তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, রাঙ্গামাটি, ৯ আগস্ট ২০০৬

কমিশন গঠিত হলেও সরকারের সদিচ্ছার অভাবে কমিশন অনেকটা অথর্ব অবস্থায়ই রয়েছে। নানা প্রতিবন্ধকতার পরে গত ৯ জুলাই ২০০৯ জাতীয় সংসদে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিল পাস হয়। কিন্তু আইনে মানবাধিকার কমিশনকে অনেকটাই দণ্ডহীন করে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[৬১] বিশেষ করে সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত মানবাধিকান লঙ্ঘনের ঘটনাকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এখতিয়ার বহির্ভূত রাখা হয়।[৬২] অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি নারীসহ আদিবাসীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সদস্যরা দায়ী বলে অভিযোগ রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে মানবাধিকার কমিশন গঠিত হলেও তা থেকে আদিবাসী পাহাড়ি নারীরা আজ অবধি কোনো সহায়তা বা সুবিচার পায়নি। জরুরি অবস্থার সময় সেনাবাহিনীর অত্যাচারের শিকার আদিবাসী পাহাড়ি হেডম্যান, জনপ্রতিনিধি ও অধিকার কর্মী রাংলাই ম্রো'কে জামিনে মুক্তির ব্যাপারে কিছুটা ভূমিকা পালন করলেও আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের ওপর চলমান সাম্প্রদায়িক সহিংসতা প্রতিরোধে মানবাধিকার কমিশনের আজ অবধি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। সহিংসতার বিরুদ্ধে নারীর সুবিচার ও ন্যায্যতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বড়ো সমস্যা আইনি সহায়তার অভাব। আদিবাসী পাহাড়িরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ার কারণে মামলা পরিচালনার খরচ যোগাড় করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। জাতীয় পর্যায়ের অনেক মানবাধিকার সংস্থাকে এক্ষেত্রে সময় বিশেষে এগিয়ে আসতে দেখা গেলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল ও সাময়িক মাত্র। আদিবাসী পাহাড়ি নারীর ওপর সহিংসতা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আইনি সহায়তা অত্যন্ত জরুরি বলে নারী অধিকার কর্মীরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

[৬১] A toothless human rights commission at best, Editorial, New Age, 11 July 2009
[৬২] HR Commission made strong, The Daily Star, 10 July 2009

কেইস স্টাডি

কেইস ১ : কণিকা চাকমা বঞ্চিত হন স্বামীর ভূসম্পত্তি আর কার্বারীপদ থেকে

পুলক বরণ চাকমা ছিল নাপ্পি পাড়ার কার্বারী।[৬৩] সে পিতার একমাত্র সন্তান। কণিকা দেবী পুলক বরণ চাকমার স্ত্রী ও তাদের ১২ বছরের একমাত্র মেয়েসন্তানের নাম দিপীকা। একদিন রাত্রে পুলক বরণ কার্বারী অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং চিকিৎসার জন্য তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে রাঙ্গামাটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় কিন্তু ওইদিন রাত্রে তিনি মারা যান। ফলে কণিকা তাঁর ১২ বছরের কন্যাসন্তানকে নিয়ে অসহায় অবস্থায় পড়েন এবং পরিবারের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে পড়ায় তিনি অসহায় বোধ করতে থাকেন। কারণ স্বামী বেঁচে থাকার সময় তিনি কেবল গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত থাকতেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর পাড়া প্রতিবেশী, মুরুব্বি এবং আত্মীয়স্বজনরা অনেকে তাঁকে আবার বিয়ে করতে বলেছিল। কিন্তু কণিকা তাদের সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ। তিনি মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে পুনরায় বিয়ে করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নেন এবং মেয়ের বিয়ে দেন। এভাবে তাঁর জীবন কেটে যাচ্ছিল। ঠিক সেসময় তাঁর শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়রা তাঁর স্বামীর সম্পত্তি পুলক বরণের কাকাত ভাইয়ের ছেলেসন্তানদের নামে লিখে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। যেহেতু কণিকা দেবীর মেয়েটির ভিন্ন গোজার ছেলের সাথে বিয়ে হয়েছে, সেহেতু মেয়ের নামে সম্পত্তি রেখে দিলে অন্য গোজায় সম্পত্তি চলে যাবে। তাছাড়া চাকমা সমাজের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মেয়েরা পৈত্রিক সম্পত্তি পাওয়ার অধিকার রাখে না। মেয়েরা বংশও রক্ষা করে না। মেয়েদের কোনো জাত নেই। তারা যে জাতের ছেলে বিয়ে করে সেই জাত হয়ে যায়। সমাজের এরূপ মতবিশ্বাসের প্রতি কণিকার আপত্তি ছিল। কণিকার প্রশ্ন ছিল, পুলক বরণের নিজের সন্তান জীবিত থাকতে তাঁকে না দিয়ে পুলক বরণের সম্পত্তি কেন তার কাকাত ভাইয়ের ছেলেসন্তানরা পাবে। এই হিসেব তিনি মিলাতে পারেননি।

তিনি রাঙ্গামাটি শহরে এসে চাকমা সার্কেলের রাজা বাহাদুরের সাথে দেখা করে তাঁকে সমস্ত বিষয় খুলে বলেন। রাজা বাহাদুর ওই মৌজার হেডম্যান বাবু সনাতন চাকমাকে ডেকে পাঠান তাঁর দরবারে। রাজা বাহাদুর হেডম্যানের সাথে আলাপ করে হেডম্যানের সুপারিশ নিয়ে কণিকা দেবীকে তাঁর মৃত স্বামীর স্থলে কার্বারী নিয়োগ দেন এবং সংশ্লিষ্ট সকল অফিসে চিঠি পাঠিয়ে দেন। কণিকা দেবীকে সার্বিক সহযোগিতার জন্য রাজা বাহাদুর সনাতন হেডম্যানকে অনুরোধ করেন। যেদিন পাড়ায় কণিকা দেবীকে কার্বারী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়, সেদিন থেকেই তাঁর ভাসুর নন্যারাম চাকমা (পুলক বরণের কাকাত ভাই) ও অন্য কয়েকজন একটা চক্রান্ত শুরু করে।

একদিন তারা পাড়ায় মিটিং ডেকে সিদ্ধান্ত নেয় যে, মেয়েমানুষ কার্বারী হতে পারে না এবং মেয়েমানুষের সালিশি মানলে পুরুষ মানুষের জন্য অমঙ্গল হবে, এমনকি এতে পাড়ার অমঙ্গলও হতে পারে। তাই পাড়াবাসীরা মিলে একজন পুরুষ কার্বারী নিয়োগ দেবে। আরো সিদ্ধান্ত হয় যে, কণিকা দেবীর কোনো ছেলে নেই এবং নন্যারাম চাকমা পুলক বরণের সম্পর্কের ভাই হয়। তাই তাকেই

[৬৩] পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের নারীর উত্তরাধিকার নিশ্চিতকরণে জেন্ডার প্রশিক্ষণ ও অ্যাডভোকেসি ম্যানুয়েল, স্বপন কুমার দেওয়ান সাম্পাদিত, গ্রীনহিল।

পাড়ার কার্বারী করা হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাড়ার সমস্ত সালিশিহ অন্যান্য কাজে মৌজার হেডম্যান ও রাজা বাহাদুরের সিদ্ধান্তকে অমান্য করে নন্যারাম চাকমা কার্বারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে শুরু করেন। বিষয়টি কণিকা দেবী মৌজার হেডম্যান সনাতন বাবুকে অবহিত করেন।

হেডম্যান নন্যারাম এবং কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠকে ডেকে পাঠান এবং পাড়ার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জানিয়ে দেন যে, এটা রাজা বাহাদুরের সিদ্ধান্ত। তখন তারা আপত্তি জানান, মেয়েমানুষ কেন কার্বারী হবে। এটা তো পাড়ার জন্য অমঙ্গল ডেকে আনবে। পুলক বরণের ছেলে থাকলে যদি তাকে কার্বারী নিয়োগ দেয়া হতো, তাতে কোনো আপত্তি থাকত না। সে তো পুরুষ মানুষের মতো যেখানে সেখানে যেতে পারবে না এবং পাড়ার উন্নয়নের জন্য একজন ছেলের মতো করে চিন্তা করতে পারবে না। নন্যারাম বলছিলেন যে, পাড়াবাসীই তাকে কার্বারী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। পাড়ার স্বার্থে তিনি দ্বিমত করতে পারেন নাই।

কয়েকদিন বাদে নন্যারাম চাকমা কণিকা দেবীর বাড়ির পাশের খোলা জায়গায়, যেখানে কণিকা দেবী শীতকালে শবজি চাষ করেন, সেটাকে নিজের জায়গা বলে দাবি করতে থাকেন। প্রায় ১০ বছর আগে জমিটা কণিকা দেবীর শ্বশুর নন্যারামের বাবার কাছ থেকে ৫,০০০ টাকায় ক্রয় করেছিলেন। বর্তমানে নন্যারামের বাবা জীবিত নেই। হেডম্যানের রিপোর্ট এবং দাগ নম্বর আছে, তবে রেজিস্ট্রেশন করা যায়নি জমি রেজিস্ট্রেশনের কাজ বন্ধ থাকায়। নন্যারাম দাবি করছেন, তাঁর বাবা বোকা মানুষ বলে মাত্র ৫,০০০ টাকায় জমিটা বিক্রি করেছিলেন। তাছাড়া সংসারের সদস্য সংখ্যা বেড়েছে। তাই তিনি এই জমি কণিকা দেবীকে দেবেন না এবং নিজেই চাষ করবেন। কণিকা দেবী সেই জমিতে বাঁশ এবং সেগুন গাছ লগিয়ে সীমানা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন।

আজ সেগুন গাছ এবং বাঁশগুলো ব্যবহার করার উপযোগী হয়ে গেছে। নন্যারাম ও তার পরিবারের সদস্যরা প্রায় সময়ই ঝগড়ার ইস্যু খুঁজে ফেরেন এবং নিজেদের মতো বাঁশ ও গাছ কেটে ব্যবহার করেন। নন্যারাম পাড়ার মুরুব্বিদের ডেকে বলেন যে, 'কণিকা দেবী তার জমিতে বাঁশ ও সেগুন গাছ লাগিয়েছে, নিজের জমি এভাবে ফেলে না রেখে সে ব্যবহার করতে চায়। এতদিন যাবৎ একজন বিধবা অসহায় নারী হিসেবে কণিকাকে জমি ব্যবহার করতে দিয়েছে।' এতে পাড়ার মুরুব্বিরা কণিকা দেবীকে পরামর্শ দেন, বাঁশ ও গাছ সমান ভাগ করার জন্য এবং জমিটা নন্যারামকে ফিরিয়ে দেবার জন্য। কণিকা দেবী আপত্তি জানিয়ে বলেন, এটা আমার শ্বশুরের কেনা, জায়গাটা আমাদের এবং আমি ছাড়ব না। কিন্তু নন্যারাম জমিটা একপ্রকার জোরপূর্বক দখল করে নেন।

কণিকা দেবী উপযুক্ত বিচারের জন্য চেয়ারম্যান, হেডম্যান বরাবরে লিখিত আবেদন করেন। উল্লিখিত কর্তৃপক্ষরা নন্যারামকে বহুবার ডেকে পাঠিয়েছেন কিন্তু নন্যারাম সেখানে না গিয়ে কণিকা দেবীকে প্রাণনাশের হুমকি দেন। বর্তমানে কণিকা দেবী নিজের বাড়িতে থাকতে পারছেন না। ভয়ে উপজেলা সদরে এসে তিনি ছোট্ট একটা ঘর তৈরি করে থাকছেন। গ্রামের বাড়িতে থাকে তাঁর মেয়ে, মেয়ের জামাই এবং দুই নাতি। মেয়ে ইউনিসেফ পাড়া কেন্দ্রের শিক্ষিকা। জামাই শাশুড়ির জায়গা দেখাশোনা করেন। কণিকা দেবী জুরাছড়ি সদরে এসে থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন প্রাণনাশের হুমকি এবং জীবনের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। পুলিশ পাড়ায় গিয়েছে কিন্তু কাউকে পায়নি।

কেইস ২ : অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নির্ভীক সংগঠক মাধবীলতা চাকমা

আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের ওপর পারিবারিক, সামাজিক ও জাতিগত নিপীড়নের শৃঙ্খল ভেঙে পাহাড়ি নারীর সমমর্যাদা ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নির্ভীক ও আপোষহীন সংগঠক মাধবীলতা চাকমা। ষাট দশকে পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীর জাতীয় জাগরণের প্রস্তুতিপর্বে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নানা বৈষম্য ও বঞ্চনার যাঁতাকলে নিষ্পেষিত আদিবাসী পাহাড়িদের সংগঠিত করার যে মহান কাজে তিনি সম্পৃক্ত হন, আজ অবধি নিরলসভাবে সেই ব্রতে ব্যাপৃত আছেন মাধবীলতা চাকমা। তিনি বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সভানেত্রী এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ১৯৩৮ সালের ২০ ডিসেম্বর রাঙ্গামাটির ছোট মহাপ্রুম এলাকার হাতিমারা গ্রামের এক মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে জন্ম মাধবীলতা চাকমার। পিতা গিরিশচন্দ্র চাকমা ছিলেন একজন মধ্যবিত্ত কৃষক। মাতা তর্কপুদি চাকমা ছিলেন একজন গৃহিণী। মাধবীলতা চাকমারা ২ ভাই ও ৪ বোন। তিনি সবার ছোট। তাঁর দু'ভাই বাঁশী মোহন চাকমা ও মদন মোহন চাকমা ছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি খুব ছোট থাকতে আনুমানিক ১৯৪১-'৪২ সালের দিকে তাঁর বাবা পরিবার-পরিজন নিয়ে মহাপ্রুম এলাকা ছেড়ে খাগড়াছড়ির কমলছড়ি গ্রামে স্থানান্তরিত হন। তাঁর জেঠা মশাই ছিলেন একজন হেডম্যান। হেডম্যানের কাজের সহায়তা করার জন্য তার ছোট ভাইকে (মাধবীলতার বাবাকে) কমলছড়িতে নিয়ে যান। সেখানে মাধবীলতার বাবা কার্বারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমলছড়ি গ্রামেই মাধবীলতার শৈশব কাটে। তৎকালীন কমলছড়ি এম.ই. স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত এখানেই লেখাপড়া করেন। কিন্তু এরপর নিকটবর্তী অঞ্চলে মাধ্যমিক স্কুলের অভাব, একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনের ফলে পারিবারিক অবস্থার অবনতি ঘটা, ইত্যাদি কারণে আর পড়ার সুযোগ হয়নি মাধবীলতার।

১৯৫৯ সালের দিকে জীবনের প্রয়োজনে জন্মস্থান মহাপ্রুমে তাঁর মাসির বাড়িতে আসেন তিনি। সে সময় তিনি ঘুইছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০.৫০ টাকা বেতনে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁর শিক্ষকতার পেশা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৬০ সালে কাপ্তাইয়ে বাঁধ নির্মিত হলে পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীর জাতীয় জীবনে নেমে আসে এক মহাবিপর্যয়। পার্বত্যাঞ্চলের ৫৪% আবাদি জমি দেখতে দেখতে কাপ্তাই বাঁধের পানিতে তলিয়ে যায়। এক লক্ষের মতো আদিবাসী পাহাড়ি তাদের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদের শিকার হয়। কে কোথায় যাবে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। অনন্যোপায় হয়ে হাজার হাজার পাহাড়ি উদ্বাস্তু ভারতে ও বার্মায় পাড়ি জমায়। জাতীয় জীবনের এই কালো অধ্যায় মাধবীলতার জীবনে স্থায়ী রেখাপাত করে।

কাপ্তাই বাঁধে উদ্বাস্তুদের মধ্যে যারা দেশে ছিল, তারা শুরু করে নতুন বসতিতে নতুন জীবন গড়া। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার লোক দেখানো পুনর্বাসন কার্যক্রম হাতে নেয়। মূলত ধানীজমির অভাবের কারণে উদ্বাস্তু পাহাড়ি পরিবারগুলোকে উদ্যান চাষে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সহায়তা প্রদান করা হতো। এ সময় পাহাড়িদের রেশম চাষেও উদ্বুদ্ধ করা হয় এবং পাহাড়িদের ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পকে জীবন-জীবিকার মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস চালানো হয়। তারই অংশ হিসেবে ১৯৬১ সালে মাধবীলতা রাজশাহীতে রেশম চাষের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং রেশম চাষে বিশেষ করে আদিবাসী

নারীদের উদ্বুদ্ধ করেন। এতে সহায়-সম্বলহারা পরিবারগুলো রেশম চাষের মাধ্যমে কিছুটা হলেও জীবিকার সংস্থান করতে পারে। পরে ১৯৬৪ সালে পুনর্বাসন কার্যক্রম উঠে গেলে সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে ৯০.৫০ টাকা বেতনে তিনি তাঁত প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন।

ষাট দশকে শুরু হয় তৎকালীন ছাত্রনেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে দ্রুত অবলুপ্তির অভিমুখে ধাবমান পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীকে জাতীয় চেতনায় জাগরিত করার মহান কর্মযজ্ঞ। সেই মহান মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মাধবীলতা চাকমা তাঁতের প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি উদ্বাস্তু পাহাড়ি নারীদের সামাজিক ও জাতিগত নিপীড়ন ও বৈষম্য বিষয়ে সচেতন করার কাজও চালিয়ে যেতে থাকেন। একপর্যায়ে ১৯৬৭ সালের দিকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁত প্রশিক্ষকের কাজ ছেড়ে দেন। এরপর রাঙ্গামাটি শহরে পাহাড়ি নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিতে তন্তুবায় সমিতি গঠনের জন্য সাধারণ পাহাড়ি নারীদের সংগঠিত করেন।

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীর প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠিত হয়। সেই সুবাদে সে সময় তিনি রাঙ্গামাটির মাঝেরবস্তি এলাকায় জনসংহতি সমিতির হেডকোয়ার্টারের সংস্পর্শে আসেন এবং সমিতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের উৎসাহে সমিতির কাজে জড়িত হয়ে পড়েন। তিনি মূলত জনসংহতি সমিতির সদস্য সংগ্রহ, নারীদের উদ্বুদ্ধকরণ, পাহাড়িদের ওপর বৈষম্য-বঞ্চনার কথা তুলে ধরার কাজ করতেন। এ সময় পাহাড়ি নারীদের সংগঠিত করার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে। একপর্যায়ে ১৯৭৩ সালের প্রারম্ভে আদিবাসী পাহাড়ি নারী সংগঠনের ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে অগ্রগামী পাহাড়ি নারীদের নিয়ে একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হতে থাকে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল পথ রুদ্ধ হলে জনসংহতি সমিতির আন্দোলন সশস্ত্র রূপ ধারণ করে। সেই অবস্থায় ১৯৭৫ সালে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মহিলা সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি নামে পাহাড়ি নারীরা রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হন। সেই সম্মেলনে তিনি মহিলা সমিতির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন।

এরপর তাঁকে বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয় ইছামতি এলাকায় (কাউখালী ও লক্ষ্মীছড়ি এলাকা)। তিনি সেখানে গ্রামের আদিবাসী নারীদের সংগঠিত করেন এবং গ্রামে গ্রামে মহিলা সমিতি গঠনের নেতৃত্ব দেন। নানা সামাজিক বাধা থাকা সত্ত্বেও পাহাড়ি নারীরা মহিলা সমিতির পতাকাতলে সমবেত হতে থাকেন। পরবর্তীসময়ে তিনি কাচালং, দীঘিনালা, পানছড়ি বিভিন্ন এলাকায় সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৬ সালে নারীকর্মীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক ও সামরিক প্রশিক্ষণ কোর্সেও তিনি সফলভাবে অংশগ্রহণ করেন। ৭৬-এর পর পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করলে মহিলা সমিতির কার্যক্রম চালিয়ে নেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। সরকারের চাপে পড়ে কিছু কিছু নারীকর্মী সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু তিনি সেই পথে হাঁটেননি। সংঘাতময় পরিস্থিতিতে মহিলা সমিতির কাজ কেবল কর্মী পরিবারের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় তিনি কর্মী পরিবার সংগঠনের ওপর মনোনিবেশ করেন। ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত জনসংহতি সমিতির জাতীয় সম্মেলনে

তিনি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। সেই থেকে তিনি এখনো সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

আগেকার দিনে পাহাড়ি নারীদের, বিশেষত চাকমা নারীদের হাটে-বাজারে যাওয়াকে দেখা হতো খারাপ চোখে। কিন্তু মহিলা সমিতির সংগঠনের ফলে সেই সামাজিক বাধা ধীরে ধীরে ভেঙে যেতে থাকে এবং পাহাড়ি নারীদের সকল ক্ষেত্রে যাতায়াতের ক্ষেত্র সৃষ্টি হতে থাকে। মাধবীলতা চাকমার মতো নারীনেত্রীদের নেতৃত্বে সত্তর দশকে নারী জাগরণের যে প্রবল জোয়ার পার্বত্যাঞ্চলের আনাচে কানাচে আছড়ে পড়েছিল তার ফলে পাহাড়ি নারীর সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। অন্তত পাহাড়ি নারীসমাজের কিছু অংশের মধ্যে অধিকার সচেতনতা এবং কঠোর সাধনার প্রত্যয় সৃষ্টি হয়।

১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মাধবীলতা চাকমাই একমাত্র নারী যিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা (অস্ত্র জমাদানকারী) জনসংহতি সমিতির তালিকাভুক্ত সদস্য। ১৯৯৯ সালে গঠিত অন্তর্বর্তী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য হিসেবে তিনি মনোনীত হন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরও তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে নারীসমাজকে শামিল করাসহ পাহাড়ি নারীর ওপর চলমান সামাজিক ও জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে বয়সের এই পড়ন্ত বেলায়ও তিনি সোচ্চার ও সক্রিয়। সংগ্রামী জীবনে নিরন্তর কর্মযজ্ঞে ডুবে থাকতে থাকতে সাংসারিক জীবন গ্রহণ করার মতো ফুসরতও মেলেনি তাঁর। চিরকুমারী থেকে তিনি পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে গোটা জীবনটাই উৎসর্গ করে যাচ্ছেন।

কেইস ৩ : পাশবিক লালসার শিকার হয়ে অসহায় পাহাড়ি বিধবা কেবলি কাঁদেন

রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বাঘাইহাটের হাজাছড়ি গ্রামের ২৬ বছরের এক বিধবার নাম সোনালী চাকমা (ছদ্মনাম)। স্বামীর মৃত্যুর পর অভাব অনটনের মধ্যেও তিন সন্তানকে বুকে নিয়ে তিনি দুঃখে-কষ্টে জীবনধারণ করে আসছেন। জুমচাষ এবং বনজ সামগ্রী বিক্রি হলো তাঁর জীবিকার প্রধান অবলম্বন। তিনি জুমচাষের ফাঁকে জঙ্গল থেকে লাকড়ি ও গাছ-বাঁশ সংগ্রহ করে বিক্রি করেন। এভাবে তিন সন্তানের মুখে দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করে আসছেন সোনালী।

উল্লেখ্য, ১৯৮৬ সালে দীঘিনালাসহ খাগড়াছড়ি জেলার অন্যান্য এলাকাতেও নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তায় বসতি স্থাপনকারী বাঙালিরা পাহাড়িদের গ্রাম জ্বালিয়ে দেবার সময় দীঘিনালার মেরুং এলাকায় তাঁদের গ্রামও জ্বালিয়ে দেয় সন্ত্রাসীরা। জীবনের নিরাপত্তার তাগিদে তাঁর স্বামী পরিবার-পরিজন নিয়ে সাজেকের গহিন অরণ্যে আশ্রয় নেন। অনেকে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয়। কিন্তু তাঁর স্বামী সেখানে যাননি। গহিন অরণ্যে জুমচাষ করে কোনোরকমে কয়েক মাসের খোরাকি যোগাড় করে পরিবার চালাতে থাকেন। কিন্তু ১৯৯২ সালে এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার অভাবে সোনালী চাকমার স্বামী হঠাৎ মারা যান। এরপর তিনি তিন সন্তান নিয়ে বাঘাইহাটের হাজাছড়ি গ্রামে অন্যান্য পাহাড়ি উদ্বাস্তুদের মতো নিজেও নিবাস গড়ে তোলেন। মেরুং এলাকায় তাঁদের বাস্তুভিটা বসতি স্থাপনকারী বাঙালির দখলে থাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরও তিনি

তাঁর গ্রামে যেতে পারেননি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পুনর্বাসন ও বাস্তুভিটা ফেরত পাওয়ার আশায় টাস্কফোর্সে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য ২০০০ সালে ফরম জমা দেন ও তালিকাভুক্তও হন। কিন্তু টাস্কফোর্স অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন না করাতে আজ অবধি তিনি শিক্ষা-স্বাস্থ্যসেবা বঞ্চিত অবস্থায় বাঘাইহাটের হাজাছড়ি গ্রামে রয়ে গেছেন।

এমনি অবস্থায় স্থানীয় সাজেক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান-মেম্বারের সহযোগিতায় তিনি বিধবা হিসেবে তালিকাভুক্ত হন এবং বিধবাভাতা পেতে থাকেন। বিধবাভাতা বিশেষ কিছু না হলেও অভাব অনটনের সংসারে কিছুটা হলেও সহায় হয়। কিন্তু সেই বিধবাভাতা উত্তোলন করতে গিয়ে ঘটে এক মধ্যযুগীয় পাশবিক ঘটনা, যা সোনালী চাকমার জীবনকে বিপর্যস্ত করে দেয়। বাঘাইছড়ি-বাঘাইহাটের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত দ্বিটিলা আর্মি ক্যাম্প। পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য এলাকার মতো এ ক্যাম্পেও গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয় নিয়মিত। সেদিন গাড়ি তল্লাশির এক পর্যায়ে ক্যাম্প কমান্ডারের লালসার শিকার হন সোনালী চাকমা।

সেদিন ছিল ১০ এপ্রিল ২০০৬। ঘটনার দিন সকালবেলা অসহায় বিধবা সোনালী চাকমা সরকারি বিধবাভাতা সংগ্রহ করতে বাঘাইছড়ি উপজেলা সদরে যান। বাঘাইছড়ি উপজেলা অফিসে গিয়ে জানতে পারেন যে, সেদিন বিধবাভাতা নয়, দেয়া হচ্ছে বৃদ্ধভাতা। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অফিস থেকে জানানো হয় হয়, পাহাড়িদের বিজু উৎসবের পরে বিধবাভাতা দেয়া হবে। এটা জানার পর সোনালী চাকমা দেরি না করে বাড়ির উদ্দেশ্যে খাগড়াছড়িগামী একটি কোস্টারে ওঠেন। কোস্টারটি বাঘাইছড়ি থেকে সকাল সাড়ে ১০টায় ছাড়ার পর আনুমানিক ১১টায় দ্বিটিলা ক্যাম্পে এসে পৌঁছে।

বাসটি তল্লাশি করা হবে মর্মে বাসের আরোহী অন্যান্য যাত্রীর মতো তাঁকেও বাস থেকে নামতে বলা হয়। ক্যাম্পের সুবেদার কোবাদ আলী ও অপর দুইজন আনসার সদস্য যাত্রীদের তল্লাশি করেন। তল্লাশির একপর্যায়ে তারা সোনালী চাকমার বিধবাভাতা বইটি খতিয়ে দেখেন। এটা দেখার পর সোনালী চাকমাকে যাত্রী ছাউনিতে বসিয়ে রেখে বাসের অন্যান্য যাত্রীকে বাসে ওঠার নির্দেশ দিয়ে বাসটিকে চলে যাবার ইঙ্গিত করা হয়।

বাসটি চলে যাবার পর সুবেদার কোবাদ আলী অপর দুইজন আনসার সদস্যকেও চলে যাবার নির্দেশ দেন। তারা তাকে 'স্যার' সম্বোধন করে চলে যাবার পর সুবেদার কোবাদ আলী সোনালী চাকমাকে হাতে ধরে জোরপূর্বক টেনেহ্যাঁচড়ে ক্যাম্পের একটি কক্ষে নিয়ে যান। সেই সময় অসহায় সোনালী চিৎকার করতে থাকেন। সাহায্যের জন্য আশপাশের লোকদের ডাকতে থাকেন। কিন্তু কেউ আসেনি। তিনি পাষণ্ড কোবাদ আলীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু পাষণ্ডের শারীরিক শক্তিমত্তার কাছে তিনি নিতান্তই অসহায় এক নারী।

ক্যাম্পের কক্ষে নিয়ে সুবেদার কোবাদ আলী তাঁকে ধর্ষণ করেন। সোনালী চাকমা অনেক ধস্তাধস্তি করেও ধর্ষণের হাত থেকে রেহাই পাননি। ধর্ষণের পর সুবেদার কোবাদ আলী তাঁকে হুমকি দেন যে, উক্ত ঘটনা কারোর কাছে প্রকাশ করা যাবে না। প্রকাশ করলে তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলা হবে। তারপর এক ঘণ্টা পরে আসা একটি যাত্রীবাহী চাঁদের গাড়িতে (জিপ) তাঁকে তুলে দেয়া হয়।

ঘটনা জানাজানি হলে পরদিন সোনালী চাকমাকে রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু পুলিশের অনুমতি ছাড়া হাসপাতালের চিকিৎসকরা সোনালী চাকমার মেডিক্যাল পরীক্ষা করাতে রাজি

নন। রাঙ্গামাটি সেনা ব্রিগেড কর্তৃপক্ষ ঘটনাটি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতে থাকেন। সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য বিশেষ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী কর্তৃক এ ঘটনা সাজানো হয়েছে বলে ব্রিগেড কর্তৃপক্ষ বয়ান দেন। অপরদিকে সেনাবাহিনীর সদস্যরা হাজাছড়ি গ্রামে গিয়ে হুমকি দিয়ে আসে ঘটনা নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে বা মামলা করলে সোনালী চাকমা ও তাঁর তিন সন্তানের ওপর নেমে আসবে চরম পরিণতি। একপর্যায়ে অসহায় বিধবা সোনালী চাকমা রাষ্ট্রীয় দানবের কাছে হার মানেন। তিন সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে কোনোকিছু না করে চুপিসারে গ্রামের বাড়িতে চলে যান। রাষ্ট্রের বিচার তাঁর ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়।

কেইস ৪ : বাগবাগিচা ও জায়গা-জমির জন্য বসতি স্থাপনকারীরা কেড়ে নিল অসহায় পণেমালার জীবন

পণেমালা ত্রিপুরা (৫০) স্বামী বিভীষণ ত্রিপুরা খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলার সিন্দুকছড়ি মৌজার মূড়াপাড়া নামক গ্রামের একজন অসহায় নারী। স্বামী অশিক্ষিত ও অসুস্থ। পণেমালা ত্রিপুরার পরিবার সিন্দুকছড়ি মৌজায় অবস্থিত তাঁর পূর্বপুরুষের কিছু পাহাড়ি ভূমিতে যুগ যুগ ধরে জুমচাষ করে আসছে। জুমচাষে এখন আর আগের মতো লাভ নেই। তাই পণেমালা ত্রিপুরা লোকের দেখাদেখি ভোগদখলীয় পাহাড়ে জুমচাষ না করে ফলজ ও বনজ বাগান গড়ে তুলেছেন। এসব ফলবাগানের উৎপাদন ভালো। পণেমালা ত্রিপুরা গ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিদের পরামর্শে আইন মোতাবেক স্থানীয় হেডম্যানের সুপারিশ নিয়ে জেলা প্রশাসকের বরাবরে পাহাড়ি জায়গাটি বন্দোবস্তের জন্য আবেদন করেন। বন্দোবস্তের কাজ প্রক্রিয়াধীন ছিল। কিন্তু এ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পণেমালা ত্রিপুরা তাঁর ভোগদখলীয় জায়গাটির বন্দোবস্ত নিতে পারেননি। বন্দোবস্তী প্রক্রিয়া নতুন করে শুরু হলে পণেমালা ত্রিপুরা উক্ত জায়গাটির বন্দোবস্তী পাওয়ার কথা, যেহেতু এই জায়গাটি তাঁর পূর্বপুরুষের জুমভূমি এবং মৌজার হেডম্যানও জায়গাটি তাঁর বলে সুপারিশ করেছেন।

পণেমালার ত্রিপুরার এই পাহাড়ভূমির ওপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে মো. আফসার গাজী (পিতা হামিদ গাজী), খায়রুল আলী (পিতা মৃত আজগর আলী), রুস্তম আলী ও নওয়াব আলী (পিতা আফসার গাজী) প্রভৃতি বসতি স্থাপনকারী বাঙালি ভূমিখেকোদের। পণেমালা ত্রিপুরার জায়গাটি দখলের প্রথম প্রচেষ্টা চলে ২০০৬ সালে। তখন আঞ্চলিক পরিষদ ও নাগরিক সমাজের ভূমিকার কারণে প্রথমবারের মতো বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের ওই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তবে সেসময় বসতি স্থাপনকারী বাঙালিরা পণেমালা ত্রিপুরার বাগান-বাগিচা ব্যাপকভাবে নষ্ট করে দেয়।

বসতি স্থাপনকারী বাঙালিরা আবার নতুন করে পণেমালা ত্রিপুরার বাগান-বাগিচা নষ্ট ও জায়গা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। ১০ মে ২০০৯-এ বসতি স্থাপনকারী বাঙালিরা পণেমালা ত্রিপুরার জায়গা দখল করার জন্য সদলবলে যায় এবং বাগান-বাগিচা নষ্ট করে। বসতি স্থাপনকারী বাঙালিরা পণেমালা ত্রিপুরার সৃজিত ফলজ বাগান ধ্বংস করে সে জায়গা দখলে নেয় ও নতুন করে গাছের চারা রোপণ করে।

এ অবস্থায় পণেমালা ত্রিপুরা স্থানীয় এমপি ও টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরাকে জানান। মাননীয় এমপি গত ২৫ মে ২০০৯ তারিখে মহালছড়ি উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লিখে পাঠান। ইউএনও কানুনগোকে সরেজমিনে

দেখার জন্য ঘটনাস্থলে পাঠান। কিন্তু কানুনগো নামেমাত্র গিয়ে মহালছড়িতে ফিরে আসেন এবং ইউএনও পরে এ ব্যাপারে আর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এমতাবস্থায় বসতি স্থাপনকারী বাঙালিরা ভূমি জবরদখলের জন্য আরো উৎসাহিত হয়।

বাড়তি উৎপাদনের আশায় এ বছর পণেমালা ত্রিপুরা ও তাঁর স্বামী বিভীষণ ত্রিপুরা দু'পাহাড়ে পৃথক দু'টি জুমচাষ করে। বন্য পশুপক্ষীর হাত থেকে রক্ষার জন্য স্বামী-স্ত্রী দু'জনে দু'টি জুমে পৃথকভাবে পাহারা দেন। দু'পাহাড়ে বিচ্ছিন্নভাবে দুই জুম পাহারা দেয়ার সুযোগ কাজে লাগায় ভূমিখেকো বসতি স্থাপনকারী বাঙালিরা। সেদিন ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯ সন্ধ্যায় বিভীষণ ত্রিপুরা তাঁর স্ত্রীর খবর নিতে নাম ধরে ডাক দেন। কিন্তু কোনো প্রত্যুত্তর আসে না। সাড়াশব্দ না পেয়ে বিভীষণ ত্রিপুরা ওই জুমক্ষেতটির দিকে এগোন। জুমের এদিক ওদিক খোঁজ করেন। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে বিভীষণের মনে সন্দেহ জাগে। শঙ্কা জাগে কোনো অপঘটনার। তাড়াতাড়ি তিনি জুম থেকে দু'কিলোমিটার দূরে নিজ গ্রামে যান গ্রামবাসীদের খবর দিতে। আত্মীয়স্বজন ও গ্রামবাসী মিলে গভীর রাতে খোঁজ করতে আসেন জুমে এবং আশেপাশের পাহাড়ে। অবশেষে পরদিন ভোরে গ্রামবাসীরা পণেমালা ত্রিপুরার লাশ উদ্ধার করেন তাঁর জুমক্ষেতের এক কিলোমিটার দূরের একটি ছোট ছড়া থেকে।

পণেমালা ত্রিপুরার কানের কাছে জখমের চিহ্ন পাওয়া যায়। আত্মীয়দের বিশ্বাস, হত্যাকারীরা প্রথমে তাঁকে ধরে পাহাড়ের নিচে ছড়ায় নিয়ে যায় এবং ছড়ার পানিতে ডুবিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯ খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে পণেমালার লাশের সুরতহাল তদন্ত হয়। ঘটনা প্রকাশের পর নানা ষড়যন্ত্র ফাঁদতে সামরিক ও পুলিশ প্রশাসন উঠে পড়ে লাগে। তাঁরা প্রথমে সমঝোতার জন্য পণেমালা ত্রিপুরার স্বামী ও আত্মীয়স্বজনের ওপর চাপ দিতে থাকে। দ্বিতীয়ত, তাঁরা এই হত্যাকাণ্ডকে ত্রিপুরা গ্রামবাসীর মধ্যকার বিরোধের কারণে সংঘটিত বলে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা চালায়।

৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯ গুইমারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঘটনার সরেজমিন তদন্তে ঘটনাস্থলে যান। তদন্তের পর ফেরত আসার পথে সিন্দুকছড়ি ইউনিয়ন কার্যালয়ে সাদা কাগজে পণেমালা ত্রিপুরার স্বামী বিভীষণ ত্রিপুরাসহ চার জনের স্বাক্ষর নেন তাঁরা যে তদন্তে এসেছেন তাঁর প্রমাণ হিসেবে। কিন্তু সেই স্বাক্ষর নেয়া কাগজে লিখে পুলিশ নিজে থেকে গুইমারা থানায় হত্যা মামলা দায়ের করে ৪ জন বাঙালি ও ১ জন ত্রিপুরা গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে। পূর্বে উল্লিখিত ভূমিলোভী বসতি স্থাপনকারী বাঙালি মো. আফসার গাজী, খায়রুল আলী, রুস্তম আলী ও নওয়াব আলী ঠিকই আছে; কিন্তু উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাড়তি যোগ করা হয় পণেমালা ত্রিপুরারই একজন আদিবাসী গ্রামবাসী ষোলআনা ত্রিপুরার নাম। পুলিশ স্থানীয় পাহাড়িদের কাছ থেকে খতিয়ে বের করার চেষ্টা করে পণেমালাদের সাথে স্থানীয় গ্রামের কোনো পাহাড়ির কোনোরকম বিরোধ ছিল কি না। এক পর্যায়ে স্থানীয় একজন মেম্বার ষোলআনা ত্রিপুরার সাথে পণেমালাদের সামান্য বিরোধ আছে বলে জানান। আর যায় কোথায়? সেটার জের ধরে পুলিশ বিশেষ উদ্দেশ্যে ষোলআনার নাম জুড়ে দেয় মামলায়।

এরপর প্রচার হতে থাকে, গ্রামের একই জনগোষ্ঠীর মধ্যকার বিরোধের জেরে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে পারে। সাথে সাথে ষোলআনা ত্রিপুরাকে ধরে এনে জেলে পোরা হলো। বিভীষণ ত্রিপুরা ও গ্রামবাসী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে মিনতি জানান, ষোলআনা ত্রিপুরা একজন নিরীহ জুমচাষী।

তিনি এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকতে পারেন না। তাঁকে ছেড়ে দেয়া হোক। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাছোড়বান্দা। ষোলআনাকে ছাড়বেন না। শেষে সব অনুরোধ উপেক্ষা করে তাঁকে জেলে প্রেরণ করা হলো।

পক্ষান্তরে সন্দেহভাজন প্রকৃত হত্যাকারী মো. আফসার গাজী, খায়রুল আলী, রুস্তম আলী ও নওয়াব আলীরা থাকেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাঁরা প্রকাশ্য দিবালোকে ঘোরাফেরা করলেও তাঁদের খোঁজ পায় না পুলিশ। ঘটনার পরপরই পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন ও এএলআরডির একটি তদন্ত দল ঘটনার সরেজমিন তদন্তে গেলে তাঁরা ওই ভূমিখেকো হত্যাকারী বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের সাথে দেখা করেন এবং কথাও বলেন। কিন্তু পুলিশ উক্ত প্রতিনিধিদলকে বয়ান দেয় যে, পুলিশ তাঁদের হন্যে হয়ে খুঁজছে কিন্তু পাচ্ছে না।

ঘটনার পরপরই গুইমারা সেনা জোন ও গুইমারা থানা সমঝোতার জন্য ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯ গুইমারা জোন কমান্ডার লে. কর্নেল কামরুল সিন্দুকছড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সুইনু প্রু চৌধুরীকে গুইমারা জোনে ডেকে পাঠান। পক্ষান্তরে গুইমারা পুলিশ কর্তৃপক্ষও পণেমালার স্বামী ও আত্মীয়দের থানায় হাজির হবার নির্দেশ দেয়।

১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯ দুর্বার নেটওয়ার্ক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে দাবি করে যে, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা গুইমারা থানার এসআই রাশেদুল ইসলাম ভূইঞা চিহ্নিত ভূমিখেকো সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণ করে প্রকৃত আসামিদের আড়াল করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মামলাটির দৃশ্যপট পরিবর্তনের লক্ষ্যে এসআই রাশেদুল ইসলাম ভূইঞা নিজেই মামলাটি লিপিবদ্ধ করেন এবং কায়দা করে এজাহারে নিরীহ ষোলআনা ত্রিপুরাকে আসামির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে গ্রেফতার করেন। মামলা নম্বর ০১, তারিখ ০৪/০৯/০৯, ধারা ৩০২ দণ্ডবিধি। অপরদিকে দীর্ঘদিন ধরে যারা পণেমালা ত্রিপুরাকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করে আসছিল ও হত্যার হুমকি দিয়েছিল, তাঁরা এখনো প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে তাঁরা অভিযোগ করেন।

এভাবেই পণেমালার হত্যাকাণ্ড রক্ষকদের ষড়যন্ত্রের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে হতে একসময় ধীরে ধীরে আড়াল হয়ে যাবে। সুবিচার ধরা দেবে না। পাহাড়ের উপত্যকায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে হারিয়ে যাবে একটা প্রশ্ন— জীবনের বিনিময়েও কি পণেমালাদের জায়গা-জমি রক্ষা পাবে?

কেইস ৫ : জীবনসংগ্রামে অকুতোভয় যোদ্ধা শেফালিকা ত্রিপুরা

নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আদিবাসী পাহাড়ি নারীরা সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আদিবাসী পাহাড়ি নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সর্বোপরি সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক নিপীড়নের বিরুদ্ধে আদিবাসী পাহাড়ি নারীরা নানাভাবে অবদান রাখছে। এ ধরনের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মানবাধিকার ও উন্নয়ন কর্মী শেফালিকা ত্রিপুরা ২০০৬ সালে বাংলাদেশের অনন্যা শীর্ষ দশ-এ নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৬০ সালের ৬ ডিসেম্বর খাগড়াছড়ির মাটিরাঙা উপজেলার তৈলেফার গ্রামে শেফালিকা ত্রিপুরার জন্ম। ছোটবেলা থেকে তিনি দেখে এসেছেন, পাহাড়িদের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট। তাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা নেই, নেই মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অনুকূল পরিবেশ। তাদের কেবলই বিভৎস সাম্প্রদায়িক

সন্ত্রাস আর বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা করে এগোতে হয় প্রতিদিন। এর মধ্যে নিজের যোগ্যতা ও মেধার মাধ্যমে এক অনন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন তিনি।

বিয়ে করতে না চাইলেও ১৪ বছর বয়সেই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক অলিন্দ্র লাল ত্রিপুরার সাথে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয় তাঁকে। প্রবল আগ্রহ থাকার পরও লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি তাঁর। স্বামীর বাড়ি থেকে ৫-৬ মাইল দূরে গেনমা পাড়ায় খামারবাড়িতে শাকশবজি ও ধানের চাষ করতে হতো তাঁকে। শ্রমিকদের সঙ্গে তিনিও হালচাষ করেছেন। একসময় তিনি স্বামীর কর্মস্থল দীঘিনালায় চলে আসেন। সেখানে পাহাড়িদের নিয়ে ইউনিসেফ একটি সমিতি গঠন করতে চাইলে শেফালিকার ডাক পড়ে। কারণ তিনি যেমন পরিশ্রমী তেমনই মিশুক। ফলে সবার মাঝে তাঁর একটি গ্রহণযোগ্যতা গড়ে উঠেছিল। তাঁকে এ সমিতির সভানেত্রী করা হয়। খাগড়াছড়িতে বিসিক থেকে শেফালিকা সেলাই প্রশিক্ষণ শেষে ১৯৯৪ সালে সেখানেই সেলাই প্রশিক্ষক হিসেবে চাকুরি পান। রিখটুক (ঐতিহ্যবাহী কাপড়ের বাক্স) নামে একটি কাপড়ের ব্যবসাও শুরু করেন এ সময়। কারণ তিনি জানেন, উপার্জন করতে না পারলে ছেলেমেয়েদের কিছুতেই উচ্চশিক্ষা দিতে পারবেন না। খাগড়াছড়িতে এসে তাঁর আগের অভিজ্ঞতায় গড়ে তোলেন 'খাগড়াপুর কল্যাণ সমিতি'। সমিতির প্রধান কাজগুলো হলো নারী কল্যাণ, শিক্ষা, ভূমি দখলের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি প্রভৃতি। তিনি এ সংগঠনের সভাপতি ও নির্বাহী পরিচালক।

এছাড়া নারীর ক্ষমতায়ন ও সম্পত্তিতে নারীর অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছেন তিনি। খাগড়াছড়ি ও মাটিরাঙা উপজেলায় শেষ করে এখন মহালছড়ি উপজেলাতেও কাজ শুরু করেছেন তিনি। দুর্বার নেটওয়ার্কের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে যুক্ত এই আদিবাসী পাহাড়ি নারী ২০০৩ সাল থেকে দুর্বার-এর জেলা প্রতিনিধি। দুর্বার সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমি দুর্বার করেই সাহসী হয়েছি। কোনো নারীর প্রতি যখনই কোনোরকম নির্যাতনের খবর আসে, আমি কালবিলম্ব না করে ছুটে যাই সেখানে।'

নিজে সুযোগ না পেলেও সবসময় চেষ্টা করেছেন ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিতে। বড়োমেয়ে গীতিকা ত্রিপুরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্বাবিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স করে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। দ্বিতীয় সন্তান বিনোদন ত্রিপুরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতশাস্ত্রে এমএসসি করে স্থানীয় একটি এনজিওতে কাজ করছেন। তৃতীয় সন্তান লিপিকা ত্রিপুরা কলকাতায় মিডিয়া সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করছেন এবং সবার ছোট সন্তান পিপিকা ত্রিপুরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পড়ছেন।

সুপারিশমালা

ক. সংবিধান সংক্রান্ত

- সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে আদিবাসী পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীর জাতিসত্তা, ভাষা ও সংস্কৃতিসহ সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা।
- আইএলও-এর ১০৭ ও ১৬৯ নম্বর কনভেনশন এবং ২০০৭ সালে গৃহীত জাতিসংঘ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র মোতাবেক আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা।

খ. আন্তর্জাতিক চুক্তি ও জাতীয় নীতিমালা সংক্রান্ত

- আদিবাসী ও ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠী বিষয়ক আইএলও-এর ১০৭ নম্বর কনভেনশন যথাযথভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- আদিবাসী ও ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠী বিষয়ক আইএলও কনভেনশন নম্বর ১৬৯ অবিলম্বে অনুসমর্থন করা।
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে আদিবাসী নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বতন্ত্র/বিশেষ অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা।
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে আদিবাসী নারীর অধিকার সংযোজনের জন্য আদিবাসী নারী সংগঠনসমূহের পরামর্শ গ্রহণ করা।
- জাতীয় পর্যায়ের সেক্টরাল পলিসিগুলোতে পাহাড়ি নারীসহ আদিবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে তা সংশোধনপূর্বক সন্নিবেশ করা; অথবা আদিবাসী নারীসহ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা, ভূমি, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ইত্যাদিসহ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা।
- বাংলাদেশ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্টার (BPATC), বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি, ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (NDC), জুডিসিয়াল সার্ভিস ও পুলিশ সার্ভিস প্রশিক্ষণমালায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থাসহ আদিবাসী অধিকার সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা।
- জাতিগত, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও লিঙ্গগত বৈষম্য নির্মূল করা এবং রাষ্ট্রীয় নীতি ও কার্যক্রমের মাধ্যমে এসবে পৃষ্ঠপোষকতা দানের অবসান ঘটানো।

গ. জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

- শাসনতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডে আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণের জন্য জাতীয় সংসদসহ স্থানীয় পরিষদে আদিবাসী নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা।

- পার্বত্য চুক্তির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য সকল আইন ও বিধিসমূহ সংশোধন করা বা এসব আইনে প্রয়োজনমতো বিশেষ ধারা সংযোজন করা। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ আইন কমিশনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ঘ. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন

- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে দ্রুত বাস্তবায়ন করা এবং এ লক্ষ্যে বাস্তবায়নের সময়সূচিভিত্তিক রোডম্যাপ ঘোষণা করা।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮ সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা এবং আঞ্চলিক পরিষদের কার্যবিধিমালা চূড়ান্ত করা।
- তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন কার্যকর করা এবং এ লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট জেলার আইনশৃঙ্খলা, পুলিশ (স্থানীয়), ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, মাতৃভাষায় শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা, পরিবেশ, যুব উন্নয়ন, স্থানীয় পর্যটন ইত্যাদিসহ অন্য ৩৩টি বিষয় (যাতে ৬৮টি কর্ম রয়েছে) হস্তান্তর করা এবং পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা। অন্তর্বর্তী পার্বত্য জেলা পরিষদে পাহাড়ি নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশ মোতাবেক ভূমি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধন করা ও ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করার মাধ্যমে ভূমি কমিশন পুরোপুরি কার্যকর করা।
- সকল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প ও অপারেশন উত্তরণ প্রত্যাহার করা।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক অভ্যন্তরীণ পাহাড়ি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদেরও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রাম পুনর্বাসনের উদ্যোগ বাতিল করা।
- পার্বত্যাঞ্চলের সকল চাকুরিতে পাহাড়িদের প্রতি অগ্রাধিকার নিশ্চিত করাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করার বিধান কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট আইনে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিধান সংযোজন করা।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্বে ও পরে রাবার চাষ ও অন্যান্য খাতে অস্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত জমির লীজ বাতিল করা।
- প্রত্যাগত ৯,৩২৬ পাহাড়ি শরণার্থী পরিবারকে তাদের জমিজমা ফেরত দেয়া এবং প্রত্যাগত পাহাড়ি শরণার্থীদের ব্যাংক ঋণ মওকুফ করা।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিতকরণ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সংবেদনশীলতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

পদে পাহাড়িদের অগ্রাধিকার দিয়ে নিয়োগ প্রদান করা। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে যোগ্য পাহাড়ি কর্মকর্তাদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা।

ঙ. উৎপাদন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত

- জাতীয় ও স্থানীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে আদিবাসী নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- আদিবাসী নারীদের মধ্যে নারীউদ্যোক্তা শ্রেণি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও স্বল্পসুদে বা বিনাসুদে ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- আদিবাসী নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে গৃহীত পলিসি অ্যাজেন্ডা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা।
- উন্নয়ন আগ্রাসন ও সামরিকায়নের বিরুদ্ধে এবং ভূমি, সম্পদ ও সংস্কৃতি নিশ্চিহ্নকরণ ও অঙ্গীভূতকরণ রোধ করার জন্য প্রচারাভিযান পরিচালনা করা।

চ. শিক্ষা সংক্রান্ত

- শিক্ষাক্ষেত্রে আদিবাসী নারীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা।
- আদিবাসী সংস্কৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন, রক্ষা ও প্রসারের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- আদিবাসী শিশুদের শিক্ষার বিশেষ চাহিদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক শিক্ষাসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা।

ছ. চাকুরি ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত

- আদিবাসী নারীদের বিশেষ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- প্রশাসনে আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে কোটা সংরক্ষণ করা।
- আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের কর্মসংস্থান এবং চট্টগ্রাম ও ঢাকার বিভিন্ন কারখানায় নিরাপত্তাহীন কর্মপরিবেশ থেকে পাহাড়ি নারীদের রক্ষার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণ এবং উৎপাদিত দ্রব্য-সামগ্রীর বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

জ. সহিংসতা প্রতিরোধ সংক্রান্ত

- আদিবাসী নারীদের ওপর সহিংসতা বন্ধের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অধীনে স্বতন্ত্র আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী বিষয়ক কমিশন গঠন করা।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়ি নারীদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে এ অঞ্চল থেকে সকল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প ও অপারেশন উত্তরণ প্রত্যাহার করা।

- পাহাড়ি নারীদের সহিংসতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করা। এ লক্ষ্যে বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের রেশন প্রদানের ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে বন্ধ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসিত অঞ্চলে রেশন প্রদানসহ পুনর্বাসন প্যাকেজ প্রবর্তন করা। এ লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসনের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত ও আগ্রহী বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী ও উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করা।
- আদিবাসী পাহাড়ি নারীর ওপর সংঘটিত যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, হত্যা, অপহরণ ইত্যাদি ঘটনার তদন্ত করা এবং দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা।
- সহিংস ঘটনার শিকার আদিবাসী পাহাড়ি নারীর জন্য আইনি সহায়তা প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে ঐতিহ্যগত সহায়ক ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী ও নারীর প্রতি অবিচার ও নেতিবাচক ধারণা দূরীভুত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ঝ. সম্পত্তিতে আদিবাসী পাহাড়ি নারীর উত্তরাধিকার

- সম্পত্তিতে আদিবাসী পাহাড়ি নারীর উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা।
- সম্পত্তির ওপর আদিবাসী পাহাড়ি নারীর উত্তরাধিকার বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- আদিবাসী পাহাড়ি সমাজে বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

ঞ. আদিবাসী নারী নেতৃত্বের ক্ষমতায়ন

- স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ক্ষেত্রে আদিবাসী পাহাড়ি নারীর দক্ষতার অনুশীলন করা এবং পরিবার, জাতিগোষ্ঠী ও আদিবাসী অন্দোলনে আদিবাসী পাহাড়ি নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য আদিবাসী নারীদের ক্ষমতায়িত করা।
- আদিবাসী সংগঠন ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে লিঙ্গ-সংবেদনশীল কর্মসূচি পরিচালনা করা।
- সকল প্রকার নেতৃত্ব ও শাসনব্যবস্থায় আদিবাসী নারীদের অংশগ্রহণ জোরদার করা। বিশেষ সভা, নেতৃত্ব বিকাশের ওপর প্রশিক্ষণ তথা অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্স এবং সরেজমিন সফর (এক্সপোজার) কর্মসূচি আয়োজন করা।
- প্রয়োজনীয় আস্থা অর্জনের পর সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী দায়িত্ব গ্রহণের জন্য নারীদের উদ্বুদ্ধ করা।
- নারীর ভূমিকা ও ভাবনা সম্পর্কে পূর্ব-নির্ধারিত ধারণা পোষণ না করে যোগ্যতাসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ নারীদের নেতা হিসেবে মনোনীত করা।

তথ্যপঞ্জি

১. জুম পাহাড়ের জীবন, মহিউদ্দিন আহমদ, মঙ্গল কুমার চাকমা, সোহরাব হাসান ও আবদুল আওয়াল সম্পাদিত, গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ঢাকা, ২০০৮

২. রাঙ্গামাটি : বৈচিত্র্যের ঐকতান, জেলা প্রশাসন, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, ২০০৪

৩. জাগরণ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস সংখ্যা, অরুমিতা চাকমা ও সিংকো চাকমা সম্পাদিত, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙ্গামাটি, ৮ মার্চ ২০০৩

৪. জাগরণ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন এর ৬ষ্ঠ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ২০০৪ স্মারক সংখ্যা, মেঞ্চোচিং মারমা (সম্পাদক), হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙ্গামাটি, ২০ নভেম্বর ২০০৪

৫. পাহাড়ের রুদ্ধকণ্ঠ, পাহাড়ি নারী নিপীড়ন ও প্রতিরোধ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, ডিসেম্বর ১৯৯৯

৬. পার্বত্য চট্টগ্রামের বন ও ভূমির অধিকার, রাজা দেবাশীষ রায়, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনটিগ্রেটেড মাউন্টেন ডেভেলপমেন্ট (ইসিমোড), কাঠমুন্ডু, নেপাল, ২০০৪

৭. নারী ও প্রগতি, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৫, রোকেয়া কবীর সম্পাদিত, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা।

৮. চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, পাংখো, লুসাই, খিয়াং, ম্রো, বম, খুমী ও চাক প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন, এডভোকেট জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, এডভোকেট প্রতিম রায় ও শৈলেন দে (সম্পা.), কপো সেবা সংঘ, আদালত সড়ক, বনরূপা, রাঙ্গামাটি, সেপ্টেম্বর ২০০৭।

৯. মাওরুম, দীপায়ন খীসা (সম্পাদিত), হিল রিসার্স অ্যান্ড প্রোটেকশন ফোরাম, ঢাকা, ২০০৮

১০. পার্বত্য চট্টগ্রামের বন ও ভূমির অধিকার, রাজা দেবাশীষ রায়, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনটিগ্রেটেড মাউন্টেন ডেভেলপমেন্ট (ইসিমোড), কাঠমুণ্ডু, নেপাল, ২০০৪

১১. পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের নারীর উত্তরাধিকার নিশ্চিতকরণে জেন্ডার প্রশিক্ষণ ও অ্যাডভোকেসি ম্যানুয়াল, স্বপন কুমার দেওয়ান সম্পাদিত, গ্রীনহিল।

১২. জুম্ম সংবাদ বুলেটিন, আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস সংখ্যা, তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, রাঙ্গামাটি, ৯ আগস্ট ২০০৬

১৩. মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা : জীবন ও সংগ্রাম, মঙ্গল কুমার চাকমা সম্পাদিত, এম এন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন, রাঙ্গামাটি, ফেব্রুয়ারি ২০০৯

১৪. সংহতি ২০০৯, সঞ্জীব দ্রং সম্পাদিত, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ঢাকা, ৯ আগস্ট ২০০৯।

১৫. Sanghati 2007, Sanjeeb Drong (Edited), Bangladesh Indigenous Peoples Forum, 9 August 2007

১৬. Bangladesh District Gazetteers, Chittagong Hill Tracts, edited by Muhammad Ishaq, 1971

১৭. Statistical Pocket Book Bangladesh 2008

১৮. Chakma Resistence to British Domination, Suniti Bhushan Qanungo, Kanungopara, Chittagong, 1998

১৯. 'Life Is Not Our', Land and Human Rights in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, Organising Committee, Chittagong Hill Tracts Campaign, Amsterdam, The Natherlands and IWGIA, Copenhaen, Denmark, 1991

২০. Update 1, 1992, ibid

২১. Update 2, 1994, ibid

২২. Update 3, 1997, ibid

২৩. Update 4, 2000, ibid

২৪. Land and Forest Right in the Chittagong Hill Tracts, Raja Devasish Roy, Talking Points 4/02, ICIMOD (International Centre for Integrated Mountain Development), Kathmandu, 2002.

২৫. Challenges for Judicial Pluralism and Customary Laws of Indigenous Peoples: the Case of the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, Raja Devasish Roy, in Arizona Journal of International and Comparative Law, 2004.

২৬. Migration, Land Alienation and Ethnic Conflict: Causes of Poverty in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh, Shapan Adnan, Research & Advisory Services, Dhaka, 2004.

২৭. The Economy of the Indigenous Peoples of the Chittagong Hill Tracts: Some Myths and Realities, by P. B. Chakma, Workshop on Development in the CHT organised by Forum for Environment and Sustainable development in the CHT, 1998.

২৮. Counting the Hills, Assessing Development in Chittagong Hill Tracts, Mohammad Rafi and A Mushtaque R. Chowdhury (ed), UPL, 2001.

২৯. Breaking the Barrier, edited by Mohiuudin Ahmed and Cho Hee-Yeon, Democracy and Social Movement Institute, Univerisity, Korea and Nabadhana, Dhanmandi, Dhaka, Bangladesh July 2008

৩০. Indigenous Peoples' Human Rights Report in Asia 2008, Bangladesh-Burma-Lao, Towards Social Justice and Sustainable Peace, Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) Foundation, Chiang Mai, Thailand

৩১. Mapping Chittagong Hill Tracts Census Indicators, 2001 & Trends (Bangladesh), Geographical Information System (GIS) Unit, Local Government Engineering Department (LGED), Bangladesh, International Centre for integrated Mountain Development (ICIMOD), Nepal and Mountain Environment and Natural Resources Information Systems (MENRIS), April 2006.

৩২. State of Human Rights in Bangladesh: Women's Perspective, Edited by Dr. Kheleda Salahuddin, Ms. Roushan Jahan & Prof. Latifa Akanda, Women For Women, June, 2002

৩৩. Indigenous Peoples' Human Rights Report in Bangladesh, 2007-2008, Kapaeeng Foundation, Dhaka, July 2009

৩৪. The Chittagong Hill Tracts, The Road to a Lasting Peace, Tebtebba Foundation, Bagio City, Philippines, 2000

৩৫. UNLOCKING THE POTENTIAL, Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP), People's Republic of Government of Bangladesh, Dhaka, October 2005.

৩৬. The ILO Convention on Indigenous and Tribal Populations, 1957 and the Laws of Bangladesh: A Comparative Review, Raja Devasish Roy, PRO 169, International Labour Standards Department, ILO Geneva and ILO Office, Dhaka, 2009

৩৭. BANGLADESH: Indigenous people and religious minorities still affected by displacement, International Displacement Monitoring Centre (IDMC) and

Norwegian Refugee Council (NRC), Geneva, Switzerland, 16 July 2009; Web: www.internal-displacement.org

৩৮. Traditional Occupations of Indigenous and Tribal Peoples: Emerging Trends, Project to Promote ILO Policy on Indigenous and Tribal Peoples, ILO, 2000

৩৯. CHT Livelihood Security Assessment Report, CARE-Bangladesh, Sutter, Phil, 2000

৪০. Gender Profile: The Chittagong Hill Tracts, CHTDF-UNDP 2005

৪১. Natural Resource Management Country Studies (Bangladesh Report) by UNDP-RIPP

৪২. State of Human Rights in Bangladesh: Women's Perspective, (Edited by Dr. Khaleda Salauddin, Ms. Roushan Jahan and Prof. Latifa Akanda), Women for Women, Dhaka, June 2002

৪৩. The Chittagong Hill Tracts and Nature at Risk, Philip Gain (ed.), Society for Environment and Human Development (SEHD), Dhaka, 2000

৪৪. Breaking the Barrier, Inter-asia reader on democratization and social movements, Mohiuddin Ahmed and Cho Hee-Yeon (edited), Domocracy and Social Movements Institute (DaSMI), SungKongHoe University, Seoul, Korea and Nabadhara, Dhaka, Bangladesh

সংবাদ-প্রতিবেদন

১. দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ ও ২১ জুলাই ২০০৭

২. দৈনিক সমকাল, ২৪-৩১ আগস্ট এবং ১-১২ সেপ্টেম্বর ২০০৯

৩. New Age, Dhaka, Thursday, 14 February 2008 and 11 July 2009

৪. The Daily Star, 10 July 2009

৫. www.internal-displacement.org

৬. www.pcjss-cht.org